# সাঁকো

## অষ্টম বার্ষিক পত্রিকা

# সম্পাদকীয়

আপনাদের সবার সহযোগিতায় অষ্টমসংখ্যা সময়মত প্রকাশিত হল। সহযোগিতা ক্রমেই এত স্বাভাবিক হয়ে আসছে যে বাৎষরিক পত্রিকা প্রকাশ আর পাঁচটা কাজের মত প্রায় স্বভাবে পরিণত হতে চলেছে। বিশেষ উদ্যোগ বা তাগাদার প্রয়োজন কমে আসছে। আপনজনদের অনেকেই সারা বছর ধরে নিজেদের ভাললাগা, দুঃখের, আনন্দের .... অভিজ্ঞতাগুলিকে পদ্যে, গদ্যে বা ছবিতে মনে লিখতে বা আঁকতে শুরু করে 'সাঁকো'র জন্য এবং বাস্তবে লেখা বা আঁকা শেষ হলে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করে নিজেদের সৃষ্টিকে আরও সম্পূর্ণতা দিয়ে লেজার ম্যাটে মুদ্রণের জন্য পাঠিয়ে দেয়, গত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের (নবম) দর্শকদের তোলা ছবিও ওখানে জমা হয়, বিজ্ঞাপনদাতারাও সাহায্য পাঠাতে চাইবার অপেক্ষা করেন না ... তারপর কেবল সাজিয়ে নেওয়া। বিষয়ের বৈচিত্র্য বাড়ছে, গভীরতার প্রয়োজন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বাড়ছে, ফলস্বরূপ পাঠকের গণ্ডিও বাড়ছে। পাঠকদের থেকে লেখা আসাও আর অবাক করার বিষয় নয়। আন্তঃসন্তোষ্টির জালে আটকে না পড়লে আমাদের অন্যান্য বেঁচে থাকাও উদ্যোগগুলির মত এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আশা জাগতে শুরু করেছে।

এই এক বছরে ক্রীড়াজগতে দেশের গর্বকরার মত অনেকগুলি সাফল্য এসেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শচীন তেন্ডুলকারের টেস্ট ক্রিকেটে শতরাণের অর্ধশতক পূর্ণ, এশীয় ও কমনওয়েলথ গেমস-এ একাধিক বিভাগে সাফল্য। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হত আমরা বোধহয় পারব না বা পারা সম্ভব নয়। প্রতিবেশী চীনের সাফল্য বিষ্ময় জাগাত। এরপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ ঘর থেকে ক্রীড়াবিদ উঠে আসতে লাগল, অতীতের হকির পর ক্রিকেট দিয়ে শুরু বিশ্বজয় তারপর ধীরে ধীরে আজকের অবস্থা যা খেলাধূলায় হীনমন্যতাকে অতীত করে তুলেছে।

গত সংখ্যা বের হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আমরা প্রিয়তম এক দেশনেতাকে হারিয়েছি। জ্যোতি বসু শুধু রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিরল একজন গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে অসুস্থ থাকাকালীন এবং মৃত্যুর পরে সারা পৃথিবী থেকে তাই মানুষের উদ্বেগ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা গেছে। নিজের দেহ ও চক্ষুদান করে এই মানবিক আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দিয়ে গেছেন। আমরা আমাদের পরিবার থেকেও অনেক আপনজনকে হারিয়েছি। অজিতদার মা, শিখাবৌদি (বিষ্ণুদার স্ত্রী), মাসীমা (বিপ্লবদার মা) এবং চায়ের দোকানের ভটাদা। শিখাবৌদি মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদান করেছেন, মাসীমা মরনোত্তর চক্ষুদান করেছেন। এর বাইরেও বহু বিশিষ্টজন ও পরিচিত আমাদের ছেড়ে গেছেন। আর রাজ্যের রাজৈনতিক অস্থিরতায় শহীদ হচ্ছেন সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। এঁনাদের সবার পরিবারকে আমরা জানাই সমবেদনা। এঁনাদের প্রত্যেককে জানাই প্রণাম।

ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে আমাদের চারপাশে অস্থিরতা বেড়ে ওঠার জন্য উদ্বেগলক্ষ্য করা গেছে 'সম্পাদকীয়'তে। বর্তমানে অস্থিরতা এক ভয়াবহ ও দানবিক আকার নিতে চলেছে। রাজনৈতিক হানাহানিতে মৃত্যু দৈনিক ঘটনায় পরিনত হয়েছে। নৃশংসতার মাত্রা পাশবিকতাকেও লজ্জা দেয় ক্ষেত্র বিশেষে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম বা জঙ্গলমহল বা দার্জিলিঙ-এর মত কয়েকটি জায়গায় এই অস্থিরতা আর সীমাবদ্ধ নয়। ছাত্র রাজনীতিসহ সর্বত্রই দখল নিতে তা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। খাদ্যে স্বনির্ভরতা বা সার্বজনীন শিক্ষা বা শিল্প সম্ভাবনার মত আলোর দিকগুলো অস্থিরতার অন্ধকারে দ্রুত ডুবে যাবার আশঙ্কা জাগছে। গণতন্ত্রের শিকড় আমাদের রাজ্যে নীচুতলা পর্যন্ত বিস্তৃত, ভোটাধিকার প্রয়োগ হয় ভারতবর্ষের গড়ের থেকে অনেকবেশী। ফলে প্রতিবাদ বা পরিবর্তনের সুস্থ উপায় থাকতে কেন এত সংঘর্ষ বা খুনোখুনীর কারণ বুঝতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলির একাংশের গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। ৬০ ও ৭০-এর দশকের অস্থিরতার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, আমরা শিক্ষা-শিল্প-কৃষিসহ সর্বত্র নৈরাজ্য দেখেছিলাম। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের পেছিয়ে পড়ার লজ্জা, যা ধীরে হলেও কাটছিল ৮০র দশক থেকে রাজ্যের গরিষ্ঠাংশ মানুষের সুস্থ চাহিদার ফলে। সেই নৈরাজ্য আবার দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাজ্যকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পিছিয়ে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে। এই চেষ্টাকে প্রতিহত করতে দ্রুত তৎপরতা দেখাতে হবে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষকে।

অন্ধকার কাটাতে আলোর সন্ধানে অন্বেষণের এই সন্ধিক্ষণে আমরা এবার স্মরণ করব সেই সমস্ত নক্ষত্রের কয়েকজন বাঙালীকে যাঁরা জন্মের ১৫০ বছর বা সার্ধশতবার্ষিকীতেও সমানভাবে সমাজকে আলোকিত করে চলেছেন।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ৭ই মে ১৮৬১ - মৃত্যু ৭ই আগস্ট ১৯৪১) এমন একজন বিরল মহাপুরুষ বা বিশ্বমানুষ যিনি তাঁর লেখনীতে চিন্তা ও ভাবনায় সর্বকালের সর্বদেশে সমস্ত বয়সের মানুষকে 'জীবনের জয়গান'এর সন্ধান দিয়েছিলেন। সমাজে যখনই জীর্ণতা, দৈন্যতা, অন্ধকার ... গ্রাস করে তখনই মানুষ বারে বারে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের মহাসমুদ্রে মুক্তির সন্ধানে

পারি দেয়। হতাশা আশায় পরিনত হয়। তিনি প্রথম ইউরোপের বাহিরে কোন ব্যক্তিত্ব যিনি সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে, তিনি দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের একমাত্র রচয়িতা, তিনিই পারেন জালিওয়ানাবাগের মত ঘৃন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ফিরিয়ে দিতে ইংরেজ শাসককে ... বোধহয় এইভাবে তাঁর সফলতা বা ব্যাপ্তিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয় কারণ তাঁর বিচরণের কোন গণ্ডি নেই, জীবনের সর্বত্র তাঁর সাবলীল আসা যাওয়া। আমাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এবার পুরোটাই ছিল তাঁর লেখা নাটক, নৃত্যনাট্য, গান, কবিতা প্রভৃতি দিয়ে আর বাকি নয়টি বাৎসরিক অনুষ্ঠানেও তাঁর সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে করা যায়নি। এটা বোধহয় বাঙালীর পক্ষে সম্ভবও নয় কোন সাংস্কৃতিচর্চা তাঁর সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে ঘটান। সাঁকোর প্রতিটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি রয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, আধুনিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা মানুষ চিরদিন চর্চা করতে থাকবে।

* প্রফুল্লচন্দ্র রায় (জন্ম ২রা আগস্ট, ১৮৬১ - মৃত্যু ১৬ই জুন ১৯৪৪) ভারতবর্ষের রসায়ণ চর্চায় একজন পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষের রসায়ণ চর্চার ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস তিনি দুটি খন্ডে লিখেছেন। নাম 'A History of Hindu Chemistry from Earliest Times to Sixteenth Century', তাঁর জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা তিনি দুই খন্ডে লিখেছেন। নাম 'Life and Experience of a Bengali Chemist', দুটি খন্ডই ভারতবর্ষের যুবকদেরকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। এই দুইটি রচনা ভারতবর্ষের রসায়ণ চর্চায় চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ৭৫ বয়স পর্যন্ত পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষকতা করেছিলেন এবং তারপর অবৈতনিক প্রফেসার হিসাবে রাজারহাট সাইন্স কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। টেম্পার কারখানার সঙ্গে যুক্ত আমরা সবাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত হই তাঁর স্বউদ্যোগের চিন্তা, ভাবনা ও সাফল্য থেকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প ছাড়া ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি ভারতবর্ষের রাসায়নিক ও ঔষধশিল্পের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল হল ভারতবর্ষের প্রথম ঔষধশিল্প, যা আজও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চালু রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের পুনঃ জীবনে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও ভাবনার প্রয়োগ বিশেষ জরুরী। নয়াচরে তাঁর নামে রাসায়নিক শিল্পের এক নতুন আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রস্থল গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এর বাস্তবায়নেই হোক তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।

* নীলরতন সরকার (জন্ম ১লা অক্টোবর ১৮৬১ - মৃত্যু ১৮ই মে ১৯৪৩) ছিলেন সুচিৎসক, শিক্ষাবিদ, মানব-হিতৈষী এবং স্বউদ্যোগী। তিনি বেসরকারী উদ্যোগে 'College for Medicine' ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার একটু অংশ পরবর্তীকালে ১৯১৬ সালে Carmichael Medical College-এ রূপান্তরিত হয়ে ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছিল। বর্তমানে এই কলেজের নামকরণ হয়েছে আর.জি.কর. মেডিক্যাল কলেজ। নীলরতন সরকারের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ। তিনি তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রের বাহিরেও স্বউদ্যোগী ছিলেন। অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন Rangamati Tea Comapny, National Soap Factory এবং National Tannery Company গড়ে তুলতে। তিনি কিছুদিন Director ছিলেন Boot and Equipment Factory-র। আমাদের উৎপাদন বিভাগের সদস্যরা চামড়া শিল্পের Spiral Knive তৈরীর সময় ১৯৯৭ সালে National Tannery Company গিয়েছিল। সংস্থাটি তখন রুগ্ন হলেও প্রায় সবধরনের উন্নত ধরনের machine ওখানে ছিল এবং বয়স্ক কারিগরদের ভেতর শিল্প দক্ষতা ছিল উঁচুমানের। তাঁদের কিছুক্ষেত্রে সহায়তা ও অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করেছিল। যদিও বর্তমানে কারখানাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং সমস্ত machine বিক্রি হয়ে গেছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস এঁনাদের স্মৃতিচারণা আমাদের চেতনায় আঘাত ঘটাবে। জড়তা বা স্থবিরতা কাটবে। নৈরাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হব। খাদ্যে স্বনির্ভরতার মত উচ্চ শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিল্পেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে পশ্চিমবঙ্গ।

সাঁকো, ৩৯/৩ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৪ হইতে প্রকাশিত ও লেজার ম্যাট কর্তৃক মুদ্রিত।

# সার্ধশতবর্ষে প্রণাম

**সঃ মঃ**-মোক্ষাগুন্ডাম বিশ্বেসভারায়া (জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০ - মৃত্যু ১৪ই এপ্রিল ১৯৬২), ভারতবর্ষের প্রযুক্তির এক দিশারী, ফলে তাঁর জন্মদিনটিকে তাঁর স্মরণে 'Engineer's Day' হিসেবে ভারতবর্ষে পালিত হয় প্রতি বছরে। ১৯৫৫ সালে ভারত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন পেয়েছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত কর্ণাটকে অবস্থিত Visvesvarya Iron & Steel Ltd., (VISL)-এ আমাদের পরিষেবা বিভাগের একবার কাজকরার সুযোগ হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। একটি পুরাণ স্টোরেজ ট্যাঙ্কের কার্যকারী সময়কাল নির্ধারণ করে নাইট্রোজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক হিসেবে নতুন করে (Renovate) ব্যবহারের জন্য উপযোগী করা হয়েছিল ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপ্লসিভের অনুবোধনে। প্রবাদপ্রতিম এক ব্যক্তিত্বের কাছে এটাই আমাদের মত অতি ক্ষুত্র এক প্রযুক্তি নির্ভর সংস্থার শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর দেখান দেশীয় প্রযুক্তির স্বনির্ভরতার রাস্তায় চিরদিন থাকবার চেষ্টা করব।

# সার্ধশতবর্ষে প্রণাম

ডাঃ নীলরতন সরকার

# সূচীপত্র

## স্থায়ী বিভাগ


● স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

১৮৫৭ স্মরণে—ইরফান হাবিব (মূল ইংরাজি লেখক) — *অনুবাদক— গদ্য ঃ দেবকুমার মিত্র, পদ্য ঃ পল্লববরণ পাল* — ৭

**Tribute to Dr K. Krishnagopal** — ***R. Jeyapriya w/o K. Krishnagopal*** — ১৬

আমার রবীন্দ্রনাথ — *পারমিতা* — ১৮

বাঙালী রসায়ন বিজ্ঞানী — *অমিত হবিষ্যাসী* — ২১

প্রয়াত শিখা সাহা স্মরণে — *শ্রেয়া নন্দী* — ২৩

● পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন একটি বিকল্প

**Temper** কারখানার চোখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ— পর্ব-৩, বিষয় - স্বউদ্যোগ, দ্বিতীয় অংশ — ***Temper*** *কারখানার পক্ষে বিপ্লব ভড়* — ২৫

বৃত্তিমূলক শিক্ষা—কিছু উপলব্ধি কিছু প্রশ্ন — *প্রণব রায়* — ২৮

“**Soft-Skill Training** কী এবং তার প্রয়োজনীয়তা” — *সুরজিৎ কুমার দত্ত* — ৩০

**Economic Significance of the Indian Diaspora** — ***Prasun Ray*** — ৩২


## শিশু ও কিশোর বিভাগ


**A Challenging Role** — ***Souravi Chatterjee*** — ৩৯

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় — *সংকলক-সঞ্জয় দাশগুপ্ত* — ৪০

জলছবি — *অয়ন ঘোষ* — ৪২

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০ — *অনুপম ঘোষ* — ৪৪

**Durga Puja-the festival of the elites and antisocials** — ***Sunny Roy Choudhury*** — ৪৫

**A 21st Century Love Story, Perhaps?** — ***Surya Sekhar Chakraborty*** — ৪৬

(স্ব) তান্ত্রিক — *সূর্য্যশেখর চক্রবর্ত্তী* — ৪৬

শারদীয়া — *শ্রুতিলক্ষ্মী কাবাসী* — ৪৭

স্কুল কন্যে — *মুদ্রা (শ্রীধন্যা)* — ৪৭

নেট ওয়ার্ক — *রঙ্গীত মিত্র* — ৪৭

| | | |
|---|---|---|
| নূতন প্রাচীন ছিল | *সূর্য্যশেখর চক্রবর্ত্তী* | ৪৮ |
| **Ocean** | ***Raddur*** | ৪৮ |
| সন্তু | *রোদ্দুর* | ৪৮ |
| বোমারু | *রঙ্গীত মিত্র* | ৪৮ |

**প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য**

| | | |
|---|---|---|
| কথামালা ডট্ কম্ (মেষশাবক ও নেকড়েবাঘ) | *অমূল্যভূষণ পাল* | ৫১ |
| উত্তরসূরি | *পালি বসাক* | ৫২ |
| **SMS** | *অরিত্র ভট্টাচার্য্য* | ৫৫ |
| সংস্কৃতিযাত্রা ও বাম-আন্দোলন | *সাম্যদীপ* | ৫৬ |
| মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—কেন? | *রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য* | ৫৭ |
| খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে | *চম্পা সেন চৌধুরী* | ৫৯ |
| কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সঞ্চয় চেতনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা | *জগন্নাথ রায়* | ৬১ |
| কিভাবে ভালো থাকবেন, আপনার কাজের জায়গায় | *সুব্রত ভট্টাচার্য্য* | ৬৩ |
| **TMC-R&D** টেম্পার কারখানার নবতম সংযোজন | *দেবাশীষ সরকার* | ৬৫ |
| আমি কেন ধর্ম মানি না | *শ্যামল চ্যাটার্জ্জী* | ৬৬ |

**কবিতা**

| | | |
|---|---|---|
| যে তুমি ঈশ্বর শিরা-উপশিরায় | *অরণ্য (বাংলাদেশ-এর কবি)* | ৭৪ |
| আমি একটু একা থাকতে চাই— | *দেবযানী ভট্টাচার্য* | ৭৪ |
| ঋতুরঙ্গ | *দেবযানী ভট্টাচার্য* | ৭৪ |
| নিচ্ছে শপথ | *বিকাশ ভট্টাচার্য্য* | ৭৫ |
| অনুত্তমা | *সিদ্ধার্থ দত্ত* | ৭৫ |
| ছোট ছোট স্বপ্নগুলো | *শুভংকর* | ৭৫ |
| হিং টিং ছট্ | *কনক কুমার ঘোষ* | ৭৬ |
| চাইতে পারি | *পারমিতা* | ৭৬ |
| গুচ্ছকবিতা | *পল্লবরণ পাল* | ৭৬ |
| স্বপ্নের ফেরিওলা | *অমূল্যভূষণ পাল* | ৭৮ |
| **Friendship** | **Ananya Chakraborty** | ৭৮ |
| **Silence** | **Ananya Chakraborty** | ৭৮ |

স্থায়ী বিভাগ

# স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

## ● ১৮৫৭ স্মরণে—*ইরফান হাবিব*

২০০৭ সাল এসে গেছে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-এর ১৫০ তম বার্ষিকি স্মরণ করার জন্য। স্বাধীন ভারতে বৃটিশ জমানার সময়কালের স্মৃতিচারণা করা খুবই অসুবিধা—কারণ ঐ জমানায় ১৮৫৭ সালের ঘটনার কোন স্বাধীন ও খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ ছিল না। কেবলমাত্র স্বাধীনতার পরেই এই বিদ্রোহের ব্যাপারে মানুষ বেশী বেশী করে পরিচিত হতে লাগল। যে দলিল/প্রমানাদি ১৯৪৭ সালের আগে পণ্ডিতদের কাছে অজানা ছিল তা এখন প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে বিদ্রোহীদের তথ্যাদি, নিষিদ্ধ ঘোষণাগুলি এবং অন্যান্য দলিলগুলি, সংবাদপত্রে বিদ্রোহের বর্ণনাগুলি ইত্যাদি।

### বৃহত্তম বিদ্রোহ

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কেবলমাত্র একটিই সশস্ত্র বিপ্লব পাইনি, এতবড় মাত্রার একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লব যা ভারতে আর কখনও জানা যায়নি। কিন্তু এটা তার থেকেও আরও বেশী কারণ এটা ছিল ঊনবিংশ শতকের বিশ্বের যে কোন জায়গার বৃহত্তম উপনিবেশ বিরোধী বিদ্রোহ। কেউ যদি ঊনবিংশ শতকের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লবগুলির দিকে নজর দেয় তা হলে তারা লাতিন আমেরিকার সফল উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লবগুলি দেখতে পারেন। কিন্তু সেখানেও এই আকারের উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লব ছিল না। বলিভারের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবীরা ছিলেন কিন্তু তারা কখনই একসাথে একই সময় কয়েক হাজারের বেশী ছিলেন না।

অপরপক্ষে ভারতে ১২৫ হাজারেরও বেশী বেঙ্গল আর্মির সিপাহী সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেঙ্গল আর্মির দেশীয় সিপাহীর সংখ্যা ছিল ১৩৫ হাজারের বেশী, এর মধ্যে কেবলমাত্র ৭ হাজারের মত সিপাহী ছিল ইংরেজ সরকারের অনুগত-বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৮৫৮ সালে পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বিদ্রোহীর সংখ্যা কখনই ১২৮ হাজারের কম নয়। এটাই সেই সময় বিদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর বৃহত্তম আর্মি এবং এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক ছিল। বিদ্রোহরত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অংশগ্রহণের শতকরা হিসাবে বর্তমান ভারতবর্ষের অঞ্চলের তখনকার জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ ছিল। এইভাবে, আমরা যদি মাত্রা বা আকারকে যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে ১৮৫৭ সাল কেবল মাত্র ভারতের ইতিহাসে একটি মুখ্য ঘটনা নয়, এটা ছিল আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সাধারণত শাসক শ্রেণীর নিজেদের সৃষ্ট অবস্থার জন্য বিপ্লব ঘটে। মার্কস বেঙ্গল আর্মিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রিয় সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে বৃটিশ সরকারের প্রিয় বেঙ্গল আর্মি-র বিদ্রোহ ঘটেছিল অংশত বৃটিশ ঔপনিবেশিক বিস্তারের একটি নতুন পর্ব, সাম্রাজ্যবাদী মুক্ত বাণিজ্যের জন্য। যা কিনা সমগ্র আর্মিকে নজিরহীন চাপের মধ্যে রেখে ছিল।

### বেঙ্গল আর্মির ভূমিকা

বেঙ্গল আর্মি ভারতে এবং তার বাইরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ‘তরবারির হাতল’-এর সঙ্গে তুলনীয়। মার্কস মুক্ত কারবারীদের শান্তির ভান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। এই মুক্ত কারবারী ১৮৩০ সাল থেকে বৃটিশ রাজনীতিকে কর্তৃত্ব করেছিল। এই ঘটনা লেনিনও জানতেন না। মার্কস-এর এই বিষয়ে প্রবন্ধ এখনও পর্যন্ত খুজে পাওয়া যায়নি এবং প্রকাশিত হয়নি। মার্কস-এর সন্দেহপ্রবণতার পরিপূর্ণ প্রমাণ মেলে যখন ১৯৫০-এর দশকে ইংল্যাণ্ডে জন গলাঘ এবং রোনাল্ড রবিনশনের মত ইতিহাসবিদরা ‘সাম্রাজবাদী মুক্ত বাণিজ্যর’ ব্যাপারে বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন। তাঁরা গবেষণা করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে ১৮৩২ সালের বৃটিশ সংসদীয় সংস্কারের পরে যখন বৃটিশ শিল্পপতি শ্রেণীরা কার্যত ক্ষমতায় এসেছিল তখন বৃটিশ ঔপনিবেশ বিস্তারের একটি নতুন শক্তিশালী ঢেউ-এর শুরু হয়েছিল। এটাই ছিল এই বিস্তারের প্রক্রিয়া, যে বেঙ্গল আর্মির সিপাহীদের অবিচ্ছিন্নভাবে কামানের খাদ্য হিসাবে তৈরী করা, ক্রিমিয়া থেকে চীনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা এবং মৃত্যুবরণ করা।

প্রথমে ১৮৩৯-১৮৪২ সালে ঘৃণ্য প্রথম আফগান যুদ্ধে বেঙ্গল আর্মিকে সামরিক অভিযানে নিক্ষেপ করা হল। এরপর এরা আধাবিস্মৃত গোয়ালিয়র যুদ্ধে লড়াই করল ১৮৪৩ সালে। যার ফলে উভয় দিকেই প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। এরপর ১৮৪৪ সালে সিন্দ জয় করার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর এল পাঞ্জাব যুদ্ধ যেখানে বেঙ্গল আর্মির ১৮৪৫-৪৬ এবং ১৮৪৮-৪৯ সালে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৮৫২ সালে আর্মিকে বার্মাতে পাঠান হল দ্বিতীয় বার্মার যুদ্ধের জন্য; ঐ সময় বার্মার ভিতরে

ভয়ঙ্কর মহামারী সত্ত্বেও বৃটিশের স্বার্থে দক্ষিণ বার্মা জয় করেছিল। এই আর্মিকে চীনে কুখ্যাত তামাক যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল ১৮৪০-৪২ সালে এবং আবারও ১৮৫৬-৬০ সালে। ১৮৫৪ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশকে ক্রিমিয়ায় পাঠান হয়েছিল। এইভাবে এরা ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অবিরাম লড়াই করেছিল। এমনকি ১৮৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা পারসীয়াতে যুদ্ধ চলছিল। এই সময়ে বিশ্বের কোন সৈন্যবাহিনীই এইরকম অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না। সৈন্যদের বিশ্রাম দরকার, পেশাদার সেনাপতিদের এটি একটি সাধারণ উপলব্ধি। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির কাছে ১৮ বছরের জন্য এইরকম বিশ্রাম অজানা ছিল।

সেই সময়কার অন্যান্য বৃটিশ সামরিক ইতিহাসবিদদের অপেক্ষা খুবই সৎ ছিলেন জন উইলিয়াম কেয়ী। তিনি লিখেছিলেন, কোনরকম দোষ করার শাস্তি হিসাবে সিপাহীদের বার্মাতে অথবা চীনে - যেখানে মৃত্যু নিশ্চিত, পাঠানোর হুমকি দিয়ে ভর্ৎসনা করার প্রবৃত্তি বৃটিশ অফিসারদের ভিতর সাধারণভাবেই ছিল। সিপাহীরা অতিরিক্ত ধার্মিক ছিল না, তারা কেবল মানুষ ছিল। কেন ঐ সমস্ত যুদ্ধ অভিযানে বৃটিশ আর্মিকে পাঠানো হোত না? ক্রিমিয়ার যুদ্ধই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল, যে যুদ্ধে, আপাতদৃষ্টিতে সাদা চামড়ার বৃটিশদের রক্তক্ষয় হয়েছিল।

**বেঙ্গল আর্মি সাম্প্রদায়িক নয়**

বৃটিশরা সৈন্যবাহিনী যে ভাবে তৈরী করেছিল তার মধ্যেই সৈন্যদের হতাশার কারণ ছিল। সুবিধার জন্য বৃটিশরা সেই অঞ্চলের মানুষদের সৈনিক হিসাবে নিয়োগ করেছিল যারা একই ভাষা বলতে এবং বুঝতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী। সৈন্যদের বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম বিহার এবং হরিয়ানার অঞ্চল থেকে মূলতঃ নিয়োগ করা হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের বর্তমান দুইটি ডিভিশন ফৈজাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ ছিল খুব বড় নিয়োগের জায়গা। ১৮৫৬ সালের পূর্বে এটা অবধ্ রাজ্যের মধ্যে ছিল। বেঙ্গল আর্মির ৪০ হাজারের মত মানুষ কেবলমাত্র অবধ্ থেকে এসেছিল। এই ফৌজের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, এদের বেশীর ভাগটাই নিয়োগ করা হয়েছিল জাতের ভিত্তিতে। পদাতিক সৈন্যের বেশীরভাগটাই ব্রাহ্মণ। তারা প্রায়শই শিক্ষিত ছিল এবং তাদের চিরাচরিত সাধারণ সামরিক উপাদানের প্রতি আগ্রহের তুলনায় আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার প্রতি আগ্রহ বেশী ছিল। ১৮৫০ সালে বেঙ্গল আর্মিতে কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মানুষকে নেওয়ার জন্য নিয়মের কাঠামো তৈরী করা হল। একই সময়ে, সৈন্য বাহিনীকে আয়ত্ত্বে রাখার জন্য, সুসঙ্গতিপূর্ণ কাজে উৎসাহ দেওয়া হত। বেঙ্গল আর্মিতে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার নীতি প্রবর্তিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা তখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি যে, তারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের বিষয়টি সর্বত্র ব্যবহার করতে পারত। এই ঘাটতির জন্য তারা তাদের অনুগত অফিসার এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাবিদ সৈয়দ আহমদ্ খান এর দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ্ খান তার আসবাব-এ-বগাবাত-এ-হিন্দ বইতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বৃটিশ সরকার হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহীদের একই রেজিমেন্ট এবং কোম্পানীতে রেখে ভুল করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের ভিতর রক্তপাতের বদলে নিজের ভাইয়ের কাছাকাছি এসেছিল। তাদের আর কখনও একে অপরের বিরুদ্ধে লাগাতে পারা যায়নি। এই আধুনিক সৈন্য বাহিনীর সিপাহীদের তখনকার পুরান ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সাথে কিছুই করার ছিল না। এটা বোধ হয় সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের মধ্যে সর্বাধিক আধুনিক উপাদান। যার ফলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল—এটা ছিল খুবই জাত অনুভবী এবং তথাপি সাম্প্রদায়িক নয়।

**মৌলিক কারণগুলি**

এই কারণেই সিপাহীদের চর্বিমাখানো কার্তুজগুলোকে গ্রহণ করা কঠিন ছিল। জাত-এর ব্যাপারটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ধরণের অবস্থানই কেবলমাত্র তাদের নেবার সুযোগ ছিল। তারা কখনও অফিসার হতে পারত না এবং পদোন্নতি পেত না। কুড়িজনের ভিতর একজন অথবা তিরিশ জনের ভিতর একজন খুব বেশি হলে 'জমাদার' হতে পারত। তারপর এই 'জমাদার' এর ভিতর থেকে তিরিশজনে একজন 'সুবেদার' হতে পারত এবং এদের থেকে কতিপয় 'সুবেদার' 'মেজর' হতে পারত এবং পদোন্নতির মইয়ে এটাই শেষ ছিল।

সৈন্যবাহিনীতে তাদের কোন রকম মানুষের মর্যাদা দেবার বিষয়টিই ছিল না। তাদের বেতন দেওয়া হত কিন্তু তারা মনুষ্য সমাজের নিকৃষ্টতম প্রজাতি হিসাবে তাদের অফিসারদের দ্বারা অপমানিত হতে হত। একমাত্র জাতের গৌরবই তাদের কাছে ছিল। বৃটিশ সরকার সেই গৌরবটাকেও দুর্বল করছিল গরু এবং শুঁয়োরের চর্বিজড়িত কার্তুজের ব্যবহারের মাধ্যমে। এটাও সত্য, চর্বিজড়িত কার্তুজ ব্যবহারের অনেক ভাল যুক্তি দেওয়া যেতে পারত। কার্তুজকে কামড়াইয়া ধরা এবং আঙ্গুলের সাহায্যে ভাঙ্গার ভিতর পার্থক্যটা একটা কারণ হতে পারত যুদ্ধে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নে।

বাহাদুর শাহকে যখন বিচারের জন্য রাখা হয়েছিল তখন বৃটিশ অভিশংসক (Prosecutor) বলেছিলেন, বিদ্রোহীরা যারা বৃটিশ অফিসারদের দেওয়া চর্বিজড়িত কার্তুজ ব্যবহারে আপত্তি করেছিল তারাই সেই কাতুর্জগুলো কামড়িয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটা ছিল তাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী, কোন চাপের জন্য নয়। চর্বিজড়িত কার্তুজকে প্রত্যাখান ছিল তাদের প্রতি পুঞ্জীভূত অসম্মানের বহিপ্রকাশ, বিশেষত ক্রমাগত জাতিগত ও ধর্মগত অসম্মান। যেমন তাদের খরচায় শ্বেত মিশনারীরদের গৌরবগাথা শোনার জন্য রবিবার কুচকাওয়াজ বাতিল করা অথবা ইউরোপীয়ান অফিসারদের হাতে ব্যক্তিগতভাবে অসম্মানিত হওয়া।

কিন্তু চর্বিজড়িত কার্তুজের দুর্ঘটনার থেকেও আরও মৌলিক কারণ ছিল বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহের পিছনে। যেখান থেকে বহু সংখ্যায় সিপাহীরা আসত, সেটিকে দেশের ভিতর উচ্চতম খাজনা-র অঞ্চল হিসাবে পরিণত করা হয়েছিল। ১৮২২ সাল থেকেই 'মহলয়াড়ী' পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া খাজনার বোঝার অধীনে আনা হল কৃষকসমাজ এবং গ্রাম্য জমিদারদের। নির্ধারিত স্থায়ী জমির খাজনাসহ স্থায়ী বন্দোবস্ত-এর অধীন ছিল সামগ্রিক বাংলা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রায়তারিও ছিল স্থায়ী বন্দোবস্ত যা মূলত কৃষকদের সাথে করা হয়েছিল, বোম্বাই-এ তিরিশ বছরের বন্দোবস্ত ছিল। মহলয়াড়ীতে কেবলমাত্র বিশ বছরের বন্দোবস্তই ছিল না, রাজস্ব হারও যে কোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে। তখনও পাওনা মেটানোর দায়িত্ব ছিল সমষ্টিগত। এমনকি যখন কোন একজন কৃষক অথবা জমির দখলদার খাজনা দেয়, কিন্তু তার প্রতিবেশী খাজনা দেয়নি, তখন তার নিজস্ব জমিও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরিক স্টোকস আমাদের বলেন, ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে আলিগড় জেলার অর্ধেক জমি হস্তান্তর হয়; ১৮৪১ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে মুজাফফরনগরের এক চতুর্থাংশ হস্তান্তর হয়। ১৮৩৩ সালের পরে খাজনা মুক্ত (মাফি) জমিগুলোও পাইকারী হিসাবে পুনরায় গৃহীত হয়েছিল। বৃটিশ শাসনের আগে যে সমস্ত খাজনামুক্ত জমি হিন্দু পণ্ডিত ও শিক্ষিত মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল, ব্রাহ্মণ, শিখ এবং মুসলমানের ভিতর যারা প্রধানত বৃটিশ আর্মিতে নিযুক্ত হয়েছিল সেই জমিগুলি তাদের হাতে চলে এসেছিল পরবর্তী সময়ে। জমি অধিগ্রহণের ফলে অবশ্যই সিপাহীদের ভিতর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

অসন্তোষের যে কোন উপাদানই থাকুক, এটা সত্য যে, বাস্তবিকই সমগ্র বেঙ্গল আর্মি ধাপে ধাপে, অতি উৎসাহে বিদ্রোহ করেছিল, এটা একটি নাটকীয় ব্যাপার। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, ১৩৫ হাজারের ভিতর ১২৫ হাজার সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল যা একটি অবিশ্বাস্য শক্তির বিকাশ, কেউ কোথাও দেখেনি। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের দমদমে প্রথমে শুরু হয়েছিল, এরপর মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে প্রথম দৃঢ় বিরোধিতার কাজ করেছিলেন, বিদ্রোহের শিখা মে মাসের শুরুতেই লক্ষ্মৌ-এ প্রসারিত হয়েছিল এবং ৯ই ও ১০ই মে মেরাটে পূর্ণমাত্রায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। মেরাটের সিপাহীরা ১১ই মে দিল্লী দখল করেছিল। এটাই সমগ্র আর্মির কাছে বিদ্রোহ করার চূড়ান্ত সাধারণ সংকেত হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

**জনপ্রিয় বিদ্রোহ**

এখন পর্যন্ত, প্রচুর অনুমান সত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এই হঠাৎ বিদ্রোহের পিছনে দীর্ঘ পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা ছিল অথবা সিপাহীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ-এর পিছনে কোন স্বীকৃত নেতৃত্ব ছিল। প্রভুদের যুদ্ধে নিজেদের দীর্ঘ একসাথে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সিপাহীদের ভিতর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটেছিল। এই ব্যাপারটাই একমাত্র ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিভাবে প্রথম বিদ্রোহীদের সাথে সংহতির আহ্বানে অধিকাংশ সিপাহী সাড়া দিয়েছিল। বেঙ্গল আর্মির হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ভাবত যে তাদের একটা সাধারণ অভিন্ন পরিচিতি আছে। অতএব, সিপাহীদের একটি অংশ যখন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তখন অন্যরা বাধা দিতে পারেনি। যখন আমরা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে 'বিদ্রোহ' বলে যুক্তি প্রদর্শন করি তখন সেই সময়ে অভ্যুত্থানে সশস্ত্র সিপাহীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ছোট করিয়া দেখা উচিত হবে না। বিপ্লবের মেরুদন্ড হিসাবে তারা শেষ পর্যন্ত ছিল। বিদ্রোহে সিপাহীদের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া যায় ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith)-এর Oxford History of India (১৯১৬) বইয়ে তাঁর প্রথাগত বর্ণনার মধ্যে। তাতে দেখা যায় কী ভাবে ১২০ হাজার মানুষ তাদের মৃত্যুর দিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ফাঁসিকাঠে অথবা তরাইয়ের গিরিসঙ্কটে চলে গিয়েছিল; একজনও পালায়নি, অল্পসংখ্যাকও আত্মসমর্পণ করেনি। বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা নিশ্চিতভাবে আমাদের সমস্ত রকম শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত। তাদের প্রতিরোধের বিশ্বস্ততা এবং দুর্ভোগের স্মৃতি, আশা করা যায় ভারতের জনসাধারণের হৃদয়ে চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবে।

এটাও সত্য যে বিদ্রোহী সিপাহীরা অবিলম্বে অসামরিক জনগণের ভিতর সাড়া দেখতে পেয়েছিলেন। সিপাহীরা যে

অঞ্চল থেকে ভর্তি হয়েছিল অবিলম্বে সেই অঞ্চল বিদ্রোহীদের জন্য সহানুভূতির ঢেউ-এ আলোড়িত হয়েছিল। এবং অন্যান্য শ্রেণীরাও বিদ্রোহ করেছিল।

পি.সি. যোশী সম্পাদিত তলমিজ খালদুন (Talmiz Khaldun)-এর ১৮৫৭ সালের উপর একটি অত্যন্ত ভাল প্রামাণিক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় যে বিদ্রোহ ''দেশীয় জমিদারতন্ত্র এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে কৃষকদের একটি যুদ্ধে'' পরিণত হয়েছিল। এইভাবে এটা প্রাথমিকভাবে সামন্তবিরোধী আন্দোলন এবং দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক বিরোধী অভ্যুত্থান ছিল। কেউ পি.সি. যোশীর সাথে তর্ক করতে পারে যে ১৮৫৭ সালের ঔপনিবেশিক বিরোধী চরিত্রকে খাঁটো করে দেখা অন্যায় এবং বিদ্রোহীদের সৈনিকবর্গ থেকে জমিদার শ্রেণীকে বাদ দেওয়াটা সঠিক নয়। আমরা যা দেখেছি যে, এটা স্বাভাবিকভাবেই মার্কসের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের মূল্যায়ন-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মার্কসের কাছে এটা ছিল 'একটি বিপ্লব', 'একটি জাতীয় বিদ্রোহ' যেখানে কৃষক ছাড়াও তালুকদার ও জমিদারদের একটা ভাল অংশ জড়িত ছিল। সেই সময়কালে ভারতের সমস্ত শ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সেই অঞ্চলেই ঘণীভূত হয়েছিল যে অঞ্চল থেকে বেঙ্গল আর্মি-তে অধিকাংশ সিপাহী এসেছিল। সেখানে জমির খাজনা প্রচন্ড বেশী ছিল। জমিদারদের যে জমির অধিকার দেওয়া হয়েছিল, সেই অধিকারও উত্তরোত্তর বাজেয়াপ্তের বিষয় ছিল। ১৮৫৬ সালে অবধের সংযোজন ঘটেছিল। তালুকদার-রা ছিল অবধের বিরাট সম্ভ্রান্ত জমিদার। মহলয়াড়ী প্রথা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছিল। এই মহলয়াড়ী প্রথায় জমির দখলকারী শ্রেণীর ধ্বংস হয়েছিল রাজ্যের বাকি অংশে। অতএব তখন এমন অবস্থা ছিল যে, কৃষক এবং জমির অধিকারী উভয়কেই একই উৎসের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

সাধারণত একটি কৃষক বিপ্লবের তুলনায় সেখানকার জমির অবস্থা সন্দোহাতীতভাবে ভিন্ন ছিল। মার্ক থর্নহিল (Mark Thornhill) তাঁর ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ সালের একটি বিবরণে দাবী করেছিলেন যে, উত্তর প্রদেশে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীরা মহলয়াড়ী প্রথার জন্য খুবই দুর্ভোগ ভোগ করেছিল। কিন্তু তারা বৃটিশের বাধ্য ছিল। অন্যদিকে কৃষকরা যারা বৃটিশের থেকে অনেক সুবিধা পেয়েছিল তারাই সব থেকে বেশী আক্রমনাত্মক ছিল তার স্থায়িত্বের প্রতি। জমিদারদের জয় করা এবং কৃষকদের দমন করার পরবর্তী বৃটিশ নীতির পূর্বাভাষ দেওয়া অবশ্যই একটি একপেশে বক্তব্য। যাহা হউক, অবধের গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং নিজে ভেবেছিলেন যে তালুকদাররা বিদ্রোহীদের নেতা ছিল এবং অতএব, ১৮৫৭ সালের বিখ্যাত ঘোষণা প্রকাশ করল। এই ঘোষণায় তিনি প্রকাশ করলেন যে তালুকদারদের কব্জায় থাকা অবধের সমস্ত জমি এখন থেকে বৃটিশ সরকারের বাজেয়াপ্ত হল। এটা বারে বারে বৃটিশ পার্লামেন্টে বলা হয়েছিল যে অবধের তালুকদার এবং কৃষকরা উভয়েই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। বিদ্রোহীদের গ্রামীন শিকড় ছাড়াও, মার্কস যার উপর জোর দিয়েছিলেন, শহরের উপাদানও জড়িত ছিল। বৃটিশ শাসনে শহুরে বেকারের সংখ্যা আরও বেশী বৃদ্ধি হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে সংযুক্ত হওয়ার সময় কিছু বৃটিশ পর্যবেক্ষকের হিসাবে লক্ষ্মৌ-এ হয়ত এক মিলিয়ান জনসংখ্যা ছিল না। কিন্তু, সেই সময় অবশ্যই ছয় লক্ষ জনসংখ্যা ছিল যা কিনা বিদ্রোহের পূর্বে পুলিশের ঘর জরিপের কাজ থেকে বোঝা যায়। অতএব, এটা একটি বড় শহর ছিল সম্ভবত তখনকার কলিকাতার থেকে বড়। সংযুক্তিকরণের পরে এখানে জীবন জীবিকা থেকে বঞ্চিত মানুষে ভরা ছিল কারণ রাজসভা ওখান থেকে চলে গিয়েছিল। বৃটিশ বস্তুর আমদানির জন্য কারিগর, বিশেষত তাঁতিরা সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটা লক্ষ্যনীয় ছিল কারণ, এক হাতে যখন সস্তা, কারখানায় তৈরী কাপড় ও অন্যান্য বস্তুর প্রবেশ ঘটল তখন একই সময়ে রাজসভা ও তার উপর নির্ভরশীলদের ধ্বংসপ্রাপ্তির জন্য শহুরে কারিগরদের ঐতিহ্যগত বাজারের হ্রাস হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের লক্ষ্মৌর ঘটনার একজন ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শী এল.ই.এস.রীস (L.E.S. Rees) স্বীকার করেছিলেন যে তারা ভালবাসা পাবার যোগ্য হওয়ার জন্য খুব কমই করেছে এবং তাদের ঘৃণাকে বাড়তে দেওয়ার জন্য অনেক করেছে। যা লক্ষ্মৌর জন্য সত্যি ছিল তা বিভিন্ন পরিমানে সত্যি ছিল আক্রান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ শহরের জন্য। সুতরাং, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভূমিসংগ্রামের থেকে বেশী ছিল। শহরের জনসাধারণ ও বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছিল; দিল্লী, লক্ষ্মৌ, বেরিলী, কানপুর, ঝাঁসি এবং অন্যান্য শহরগুলি প্রতিরোধের দৃঢ় সঙ্কল্পিত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের মনে রাখতে হবে বৃটিশরাজ জোর করে কর আদায় এবং শিল্পগুলি বন্ধের প্রক্রিয়া চালু করে। যার ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্রতার শিকার হতে হয়েছিল। এই জোর করে কর আদায়ের কারণ ছিল যথেষ্ট,

এই অর্থ প্রতিনিয়ত তাদের পাঠাতে হত তথাকথিত 'হোম চার্জেস' (Home Charges) মেটাবার জন্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইউরোপে স্থানান্তরিত করার জন্য। ঔপনিবেশিক শোষনের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে বহু শ্রেণী, যারা নিজেদের এই দুর্দশার কারণ হয়ত জানত না, বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে বৃটিশ রাজের পতনের মধ্যেই তাদের মুক্তির উৎস। অতএব, গ্রাম এবং শহরের মানুষ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

**জনসাধারণের কাছে আবেদন**

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৫০ সালে যে দলিল প্রকাশ হল, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে বিদ্রোহীদের অনুভূতিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। উদাহরণের জন্য মুঘল রাজা ফিরোজ সাহ্-র ২৫ অগাষ্ট ১৮৫৭ সালের ঘোষণা যেখানে সেই সময়ের অনেক জনপ্রিয় অসন্তোষের তালিকা আছে এবং জনসাধারণের অনেক অংশকে বিদ্রোহের পতাকার নীচে আকর্ষিত করার জন্য নিশ্চিত নির্দিষ্ট অঙ্গীকারের সন্ধান আছে। এটা শুরু করা হয়েছে জমিদারদের কাছে আবেদন করে যে বৃটিশরা তাদের উপর প্রচুর খাজনা ধার্য করছিল এবং বাদশাহী সরকার কেবলমাত্র উৎপাদনের অর্ধেক খাজনায় গ্রহণ করবে; সেই জমিদারদের কর মকুব করা হবে যারা অর্থ এবং মানুষ দিয়ে সহযোগিতা করবে; যারা শুধুমাত্র অর্থ দেবে তাদের উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ কর হিসাবে দিতে হবে। আরও, তাদের মর্যাদা সাধারণ রায়ত'-এর বিপক্ষে সুরক্ষিত থাকবে। ব্যবসায়ীরা আর্থিক সাহায্য পাইবে এবং তাদের পণ্য দ্রব্য পরিবহনের জন্য সরকারের বাষ্পচালিত জাহাজ ও গাড়ির সুবিধা পাবে। এটা বাহ্যত একটি নিদিষ্ট 'আধুনিক' পরিকল্পনা। সরকারি চাকুরে এবং সৈনিকদের বেতন বাড়ানো হবে। কারিগরদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয়েছিল যে, বৃটিশ দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করিলে তাঁতি, তুলার বেশকার, ছুতোর, কামার এবং মুচি ইত্যাদি বেকার হয়েছিল ফলে সমস্ত রকমের দেশীয় কারিগরকে ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। সবশেষে হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েরই পণ্ডিত, ফকির ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জমি দেওয়া হবে যদি তারা বিদ্রোহীদের সপক্ষে ঘোষণা করে। এটা দেখা যাবে যে, কার্যত কৃষকদের ছাড়া সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছেই আবেদন করা হয়েছিল। স্পষ্টভাবে, এমনকি ফিরোজ সাহ্-র মত খুব বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়মনস্ক বিদ্রোহী নেতারাও তখন কৃষক অসন্তোষের পূর্ণ ক্ষমতা এবং বিদ্রোহীদের সফলতার মূল্য বুঝতে পারেনি। আরও, এমনকি খুব ঐতিহ্যবাহী বিদ্রোহী নেতাদের জনগণের কাছে আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। এটা বিশেষভাবে দেখা যায় তাদের মুদ্রনযন্ত্রের ব্যবহারে ঘোষণা প্রকাশ করার মাধ্যমে।

অবধ্ রাজসভা বিরজিস কাদর (Birjs Qudr)-এর নামে মুদ্রিত জমিদারদের এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (ইসতিহারনামা) প্রকাশ করেছিল। এই বিজ্ঞপ্তিটি দুইটি হিন্দুস্থানী ভাষার দলিল ছিল, ডানদিকে উর্দুতে এবং বামদিকে নাগরীতে ছিল। ভাষাটি সুচিন্তিতভাবে সরল রাখা হয়েছিল, এই দলিলটিই প্রমাণ করে যে হিন্দি-উর্দু বিতর্ক তখনও প্রকাশ পায়নি। এস.আতহার আব্বাস রিজ্ভি (S. Athar Abbas Rizvi) এই বিজ্ঞপ্তি হুবহু নকল প্রতিরূপ প্রকাশ করেছিলেন এবং এর সাথে নানা সাহিব (Nana Sahib)-এর ইস্তেহারও ছাপিয়ে ছিলেন। ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কানপুরে ছাপানো হয়েছিল একইরকম ভাবধারায় কিন্তু সরল উর্দুতে। বিদ্রোহীদের দিল্লী নিয়ন্ত্রণের পুরো সময়কালে (মে-সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) সাপ্তাহিক উর্দু সংবাদপত্র ছাপা হত এবং শহরে প্রকাশিত হত।

**ধর্মীয় মতভেদের পরাজয়**

নানা সাহিবের শেষোক্ত ঘোষণাটিও অন্যদিকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছু ইতিহাসবিদের অনেকদিনের অভ্যাস নানা সাহিব এবং ঝাঁসির লক্ষ্মী বাইকে হিন্দু কেন্দ্রের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে দেখা এবং দিল্লী ও বেরিলীকে 'মুসলিম' কেন্দ্র হিসাবে দেখা, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিত্তিস্বরূপ শত্রুতা বোধের ধারণা সহ। কেউ ভি.এ.স্মিথ (V.A. Smith)-এর Oxford History of India বইয়ে বিদ্রোহীদের বিবেচনা করার মধ্যেই এই ধারণা কীভাবে কাজ করে দেখতে পাবে। এই ধারণা যে কত ভুল তা প্রকৃত ঘটনায় দেখতে পাওয়া যায় যে কেবলমাত্র নানা সাহিবের উর্দুতে হিজরি তারিখসহ ইস্তাহার প্রকাশনায়, কিন্তু এর মূল বিষয় হল যে তুর্কীর সুলতানের ভারতবাসীর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা। অতএব, যখন বৃটিশ জাহাজ ভারতের জন্য ইউরোপীয় সৈন্যদের ঈজিপ্ট-এ আনছিল তখন সুলতান ইংরেজদের হত্যা করার জন্য ঈজিপ্টের পাশাকে ফরমান জারি করেছিলেন। এটা অবশ্যই একটা উদ্ভট কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। তথাপি সুলতানের কাছে সহযোগিতা প্রত্যাশা করাটাই হল ভাল প্রমাণ যে নানা সাহিবের বিশ্ব-দর্শন ধর্মীয় সংস্কারে মেঘাচ্ছন্ন ছিল না। যেমন ঝাঁসীর রাণী, যাঁর খুব দৃঢ়মনস্ক যোদ্ধার মধ্যে কিছু মুসলিম গোলন্দাজ এবং পাঠান রক্ষক ছিল। অনুমান অনুসারে

'মুসলিম'-এর তরফে ছিল, যে পথে জিহাদের মান ১৮৫৭ সালের মে মাসে দিল্লীর জামা মসজিদ থেকে সরানো হয়েছিল পাছে এটা আশঙ্কা না করা এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছে এবং জুলাই মাসে মুসলিম ইদ্-উজ-জুহা উৎসবে গরু ও মহিষ হত্যা নিষিদ্ধ করা। এগুলিই বিদ্রোহীদের সমস্ত রকম ধর্মীয় বিতর্ক রোধ করার দৃঢ়তাকে প্রমাণ করে একটি জায়গায় যেখানে পারসিভাল স্পিয়ার (Percival Spear) দিল্লীর বিদ্রোহী শাসনের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তাদের সাফল্যকে খুব লক্ষণীয় বলে সম্মান দেয়। বেরিলীতে মুখ্য বিদ্রোহী নেতা বাহাদুর খান হিন্দু প্রধানদের কাছে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করার আবেদন ছেপে ছিলেন। এতে হিন্দুরীতির উপর বৃটিশের আক্রমণ এবং নিষিদ্ধ করণের বিস্তারিত বিবরণ ছিল এবং গরু হত্যা ও গরুর মাংস ভক্ষণ চূড়ান্তভাবে শপথ নিয়ে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

রজতকান্ত রায় তার গুরুত্বপূর্ণ বই Felt Community-তে বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মনোভাব খুব ব্যাপক ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট সত্যটির উপর জোর দিয়েছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে অধিকাংশ অংশ গ্রহণকারী যারা এমনকি সিপাহী ছিল না কিন্তু সাধারণ নাগরিক ছিলেন, তাদের মনে ধর্মীয় মত পার্থক্য আশ্চর্যজনক ভাবে কমে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর হিন্দুরা মুসলিমদের তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করত; মুসলিমরা হিন্দু সুবেদার মেজরকে তাদের সর্দার/নেতা হিসাবে গ্রহণ করত। মুসলিমদের মধ্যে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায় যুদ্ধের আবেগে বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। তাদের মুজাহিদ অথবা জিহাদি বলে ডাকা হোত (বৃটিশ সরকারি অনুবাদে 'Fanatics' এবং কখনও ভুলভাবে Wahabis হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল)। তখন একইরকম গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন ছিল যাতে হিন্দু ও মুসলমানরা এক সাথে হয়ে সর্বজনীন কারণে যুদ্ধ করে, নিশানা ছিল কেবলমাত্র বৃটিশ।

বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক আহমদুল্লাহ সাহ্-র নিশ্চিত আশ্রয়ে রচিত রাইসিলা ফতেহ-ই ইসলামে হিন্দু ও মুসলিমদের তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসকে বৃটিশ শাসকদের থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন বারে বারে করা হয়েছে।

গণ বিদ্রোহ অনুষ্ঠানের সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল বাহাদুর খান দুইটি ব্যানার সহ বেরিলির মধ্যে চলাফেরা করতেন। একটা ইসলামের সবুজ ব্যানার, অন্যটা বড় পবিত্র ধ্বজা। এটা রজত রায় একজন বাঙালীর থেকে জোগাড় করেছিলেন। একই রকম আচার নানা সাহিব কানপুরে করেছিলেন।

চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতপাতের প্রশ্ন, যা বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রায়শই উপেক্ষিত হত। W.W. Hunter তাঁর Indian Musalmans (1871) বইয়ের ভূমিকাতে স্বীকার করেছিলেন যে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে ফারাকের পুরাতন বিপদ ভারতে বৃটিশ শক্তিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। এটা ছিল একটি বাধা/প্রতিবন্ধক যা কেবলমাত্র শক্তি ও ঐশ্বর্য দ্বারা রাখা হয়নি, রাখা হয়েছিল স্পষ্ট জাতপাতের দ্বারাও। যদিও ভারত সব সময় সামাজিক যাজকতন্ত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। বিদ্রোহী নেতারা নিজেরা চেষ্টা করত এই চিরাচরিত সামাজিক যাজকতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা এবং শক্তিশালী করা। বর্ণের ভিতের উপর এই ধরনের জাতপাতের ভেদাভেদ তাদের অজানা ছিল। (পরবর্তীকালে ভারতীয়দের থেকে আলাদা রেলগাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইউরোপীয়নদের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য। যাঁরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতন, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service) কে বৃটিশের এক মহতী অবদান বলে প্রশংসা করতেন, তাঁরা ভুলে গেছেন যে ১৯১৬ সালেও কুড়িজন আই.সি.এস অফিসারের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ভারতীয় ছিলেন।) একবার যখন ইংরেজদের কোনও অঞ্চলে উৎখাত করা হল, তখন সাধারণ উপলব্ধি নিশ্চিতভাবেই ছিল যে এখন সম্পর্ক উল্টে গেছে, ভারতীয়দের চেতনায় গর্ববোধ উদয় হয়েছে। রজত রায় ভাল করেছেন এই ব্যাপারে জোর দিয়ে।

**ব্যর্থতার কারণগুলি**

ভারতের মহান বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার অনেক কারণ পেশ করা যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এর পিছনে কোনও সংগঠিত ষড়যন্ত্র ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের শুরুতে ফন্দি ও পরিকল্পনা করা আরম্ভ হল। এই ধরনের বিস্তারিত পরিকল্পনার কোনও প্রমাণ নেই যা বি.জে.পি তার এন.সি.আর.টি পাঠ্য বইয়ে ঢুকিয়েছিল যেখানে এগুলোকে নানা সাহিবের উপর আরোপিত করা হয় এবং অপরিণত আরম্ভের জন্য গর্ব ও সুপ্রস্তুত পরিকল্পনাকে নষ্ট করা হয়। 'কেউ ভারতের বিপ্লবকে আধুনিক ইউরোপীয় বিপ্লবের মত করে আশা করতে পারে না'—মার্কসের এই ব্যক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতার উপাদান হিসাবে হাজির হয়। ভারতে তখন কোন বড় বুর্জোয়া ছিল না, ছিল না কোন শ্রমিকশ্রেণী। তখন কোনও রাজনৈতিক পার্টি ছিল না। ফরাসী বিপ্লব

বিকশিত হত না, যদি না জ্যাকোবিনদের (ফ্রান্সের বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য) প্রতিষ্ঠা হত যদিও তাদের জ্যাকোবিন ক্লাব সত্যই একটি রাজনৈতিক পার্টি ছিল। এই ধরণের সংগঠনগুলি ফরাসী বিপ্লবে দিশা, গতি এবং সাহস দিয়েছিল। মাও জে দঙ তাঁর দীর্ঘ ধারাবাহিক চীনা কৃষক বিপ্লবের চরিত্র বর্ণনায় বিশেষ করে ব্যর্থতার কারণগুলি উল্লেখ করেন সেখানে বিপ্লবকে পথ দেখাবার জন্য কোনও রাজনৈতিক পার্টি না থাকাটাই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে দেখান। Antonio Gramsci, মহান মার্কসাবাদী চিন্তাবিদদের একজন, তাঁর 'The Modern Prine' প্রবন্ধে বাস্তবিকই বলেছেন যে রাজনৈতিক পার্টি হল আধুনিক সংগঠনের ভিত্তিস্বরূপ এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য অবশ্যই তার নিজস্ব পার্টি হল কাজের একটি কঠোর হাতিয়ার। তখন শ্রমিকশ্রেণী এমনকি আধুনিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্রোহের অঞ্চলে ছিল না। এই শ্রেণীগুলি এবং রাজনৈতিক পার্টি স্বরূপের কাছে জবাবদিহি করার মত কোন সংগঠনের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহী নেতারা পুরনো ধাঁচের রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারেই কল্পনা করতে পারত। মূলতঃ বৃটিশ পূর্ব একটি কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের প্রতি অনিশ্চিত আনুগত্যে একত্রে সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক সরকারগুলির রীতিনীতির পুনরুদ্ধার করা। তারা একটি আধুনিক ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্রের কথা ভাবতে পারত না যদিও তারা নিশ্চিতরূপে সেই ভারতের কথা ভেবেছিল যেখানে তারা আনুগত্যে বাধ্য থাকবে।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে বিদ্রোহীরা Birjs Qadr নামে মুদ্রিত একটি সাহসী উত্তর দিয়েছিল রাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার জবাবে। তারা বলেছিল যে, রাণী যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি ভারতীয়দের দেখাচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতারণাপূর্ণ ছিল। বৃটিশ একটার পর একটা ভারতীয় রাজ্য ধ্বংস করেছিল এবং বিদ্রোহীরা তার তালিকা দিয়েছিল তাতে কার্যতঃ প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বৃটিশরা ধ্বংস করেছিল, এই তালিকায় মহীশুরের টিপু সুলতান থেকে পাঞ্জাবের দলীপ সিং ছিল। বিদ্রোহীরা এইভাবে সমগ্র 'হিন্দুস্তান'-এ কি ঘটছিল তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। ঘোষণায় সিপাহীদের এবং বিদ্রোহীদের বৃটিশদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছিল কারণ সবশেষে বৃটিশরা তাদেরই হত্যা করবে। রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতি মানে -কিছুই না। কেবলমাত্র কাঠ কাটা, জল তোলাতেই ভারতীয়দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ছিল রাণীর অধীনে, বাড়ীর মালিকানা তাদের ভাগ্যে ছিল না। ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে যখন সব কিছু ব্যর্থ বলে ধারণা হল তখনও জবাবটি ছিল সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট এবং আপোষহীন। হৃদয় উষ্ণ হতো এটা বুঝে যে বিদ্রোহীরা এখনও ভারতের কথা বলে এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকে।

আবেগের এই দৃঢ়তা কার্যক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এমনকি বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা কখনওপরিচালনায় ঐক্য অর্জন করতে পারে নি। তাঁরা তাদের বিভিন্ন ইউনিটের সাথে সহযোগিতা করেছিল অথবা বিভিন্ন প্রথাগত কর্তৃপক্ষের কাজে যোগদান করেছিল। তাদের কোন একক উচ্চ পরিচালক ছিল না কারণ সিপাহীদের ভিতর কারুরই অফিসার হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না; তারা কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনী ছিল যদিও তাদের নেতাদের তখন জেনারেল অথবা কর্ণেল বলে ডাকা হত। এটা সত্যি যে তারা কেবলমাত্র ইংরেজ সামরিক উপাধিকেই অনুসরণ করত না। তারা তাদের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করার জন্য অধিকাংশ জায়গায় 'কাউন্সিল' গঠনের দিকে যেত। দিল্লীতে তারা কাউন্সিল এফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (Council of Administration) গঠন করেছিল। যেটা সব দিক থেকেই বৃটিশ রীতির অনুকরণে ছিল। ক্ষমতার এই ব্যবস্থা কখনওই বিদ্রোহের জন্য জরুরী ঐক্যবদ্ধ পরিচালকমণ্ডলী বা নেতৃত্বের বিকল্প হতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না, তার সামরিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। বৃটিশরা প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীর স্থান পরিবর্তনের জন্য কৌশল এবং পরিকল্পনার উদ্ভাবন করতে পারত, এটাই ছিল বৃটিশদের গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলির একটি। সিপাহীরা কেবলমাত্র যুদ্ধের কৌশল স্থির করতে পারত কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে তাদের সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারত না। সংখ্যায় অনেক হওয়া সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হতে পারত।

ফলস্বরূপ, বিদ্রোহীরা প্রকৃত পক্ষে, শত্রুদের দুইটি সাঁড়াশি আক্রমনের মধ্যে আটকে পরল—একটা পূর্ব থেকে আর একটা উত্তর পশ্চিম থেকে এবং সবশেষে এমন জালে জড়িয়ে পড়ল যে ধ্বংস হয়ে গেল। যাহা হউক, তারা খুব সহজে পরাজিত হয়নি। বখত খানের নেতৃত্বে দিল্লীর প্রতিরক্ষা চার মাসের বেশী টিকে ছিল। জেনারেল ক্যাম্পবেল (General Compbell)-এর প্রথম আক্রমণকে পরাস্ত করে লক্ষ্মৌ প্রায় দশ মাস টিকে ছিল। সৈন্যবাহিনীর গোয়লিয়রের অংশটি বৃটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে কানপুর দখল করেছিল জেনারেল উইন্ডহ্যাম (General Windham)-এর উপর আঘাত হেনে। এটা ভারতে বৃটিশের কিছু অল্প কয়েকটি যুদ্ধে

পরাজয়ের মধ্যে একটি ছিল। সাহসী রাণীর নেতৃত্বে ঝাঁসীর তীব্র প্রতিরোধ স্মরণীয় হয়ে আছে। জগদীশপুর এর বৃদ্ধ এবং সক্ষম শাসক কুঁওড় সিং (Kunwar Singh)-এর আশ্চর্যজনক ভাবে বৃহৎ অঞ্চলে সামরিক অভিযান সর্বকালের একটা মহাকাব্য ছিল। তাঁতীয়া তোপী সাহসের সাথে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রায় দু বছর যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসী হয়েছিল। বিদ্রোহীরা যুদ্ধ ছাড়া বা প্রতিরোধ ছাড়া কখনও পিছু হটেনি। হার মানেনি।

যে সমস্ত বিদ্রোহীদের উপর অত্যাচার এবং ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাদের বারবার বর্ণনা এখানে মনে রাখার জন্য। তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল মাথা নত না করে এবং কোন একজনও ক্ষমা প্রার্থনা না করে। বারংবার একইরকম নির্বিকার এবং উদ্যত ঝলকানি ছিল যা পরবর্তীকালে ১৯১৫ সালের সিঙ্গাপুর বিদ্রোহে দেখা যায় এবং এটা কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যেই নয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল। পাটনার একজন বই বিক্রেতা পীর আলি (Peer ali)-র আচরণের উপর লেখা The Sepoy War-এর লেখক জে.ডব্লিউ.কায়ে (J.W. Kaye)-এর কথা শোনা যাক।

'ভারী পায়ের বেড়ি পরান এবং তার দেহের ক্ষতের রক্তের গভীর দাগযুক্ত ময়লা জামাকাপড় পরান অবস্থায় কমিশনার এবং ইংরেজ ভদ্রলোকদের সামনে আনা হয়েছিল।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সে কোনও তথ্য জানে কিনা যা সরকারকে প্রভাবিত করবে তার জীবনকে অব্যাহতি দিতে। মর্যাদাপূর্ণ স্থৈর্য সহকারে, যা ইংরেজরাও উত্তেজনার পরিস্থিতিতে বজায় রাখতে পারে না, সে তার প্রশ্নাবলীর মুখোমুখি হয়েছিল, সে ইংরেজদের অত্যাচারের নিন্দা করেছিল। পীর আলিকে তখন বের করে আনা হয়েছিল। তার ফাঁসি হয়েছিল এবং তার বাড়ি ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

**বৃটিশের নৃশংসতা**

এটা প্রায়ই বলা হত যে ইংরেজ মহিলারা অসম্মানিত হত; বৃটিশ পার্লামেন্টে এই বিষয়ে বারে বারে বলা হত। লক্ষণীয় দুরদর্শিতার সাথে মার্কস এই উত্তেজক গুজব বিশ্বাস করেননি, এই ব্যাপারটা ১৮৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিলের New York Tribune-এ তাঁর প্রবন্ধে দেখতে পাওয়া যাবে। বিদ্রোহ দমন করার পরে, ইংরাজ মহিলাদের উপর বিদ্রোহীদের উৎপীড়নের প্রমান সংগ্রহের জন্য ইংরেজের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তথাপি তারা ''দেশীয় অধিবাসীরা আমাদের মহিলাদের অসম্মান করেছে'' বলে চিৎকার করত, এটা ছিল ইংল্যান্ডে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচারের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের সমস্ত বর্বরতার সমর্থনে এটাকে ব্যবহার করা হত।

এমনকি সম্ভবত কানপুর হত্যাকান্ড সম্বন্ধে যা পরে ঘটেছিল, জানার আগেই ইংরেজরা ভারতীয় পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। J.W. Kaye উভয় সঙ্কট সম্বন্ধে কি বলেন, সেটা শোনা যাক, যা বৃটিশের অত্যাচারকে জাহির করেছিল।

'একজন ইংরেজ পুরুষের ঘৃণমিশ্রিত ক্রোধের ফলে শ্বাসরোধ হয়ে যেত যখন সে পড়ত যে মিসেস চেম্বারস্ অথবা মিস্ জেনিংস্ কে কালো গুণ্ডারা ফালি ফালি করে কেটে মেড়ে ফেলেছিল। কিন্তু দেশীয় ইতিহাসে এবং দেশীয় কাহিনী ও বিশ্বাসে আমাদের লোকদের বিরুদ্ধে নথিবদ্ধ ছিল যে ইংরেজের প্রতিশোধের প্রথম ধাক্কায় মায়েরা, স্ত্রীরা এবং কম পরিচিত শিশুরা চরম দুর্দশায় পড়ে গিয়েছিল। এই কাহিনীগুলিতে আমাদের হৃদয়কে বিদীর্ণ করার মত গভীর করুণ রস ছিল।'

এই ধরণের অত্যাচার বৃটিশরা বিদ্রোহের শুরুতেই ঘটিয়ে ছিল, এই ঘটনা বিদ্রোহীদের উদ্দীপ্ত এবং কঠোর করেছিল। এঙ্গেলস্ ১৮৭০ সালে পুনরায় স্মরণ করেছিলেন যে ইংরেজরা যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে যুদ্ধের সমস্ত আইন-কানুন অমান্য করেছিল এবং এটা করেছিল অকল্পনীয় চরম নিষ্ঠুর উপায়ে যেমন শরীর কোচকান অবস্থায় বেঁধে ফাঁসি দেওয়া এবং বিশেষ প্রিয় বন্দুকের মুখ থেকে বন্দীদের উড়িয়ে দেওয়া। একদম শুরু থেকেই, ১৮৫৭-এর জুনের গোড়াতেই কর্ণেল জেমস নেইলের অভিযানের সাথে বৃটিশরা ভয়ঙ্কর পর্যায়ের অত্যাচারগুলি করেছিল যেহেতু তারা প্রত্যেকটি গ্রাম অথবা শহরকে বিদ্রোহীদের থেকে পুনরায় উদ্ধার করেছিল। সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সালে দিল্লীর পতনের ফলে সেখানে অসামরিক নাগরিকদের উন্মত্ত সর্বজনীন হত্যাকান্ড হয়েছিল, ফলে সমগ্র শহর বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হয়। এর বর্ণনা William Dalrymple-এর Last Mughal-এ পড়া যেতে পারে। বৃটিশের প্রতিটি পরবর্তী সফলতাকে চিহ্নিত করা হত একইভাবে। সর্বজনীন হত্যাকান্ড এবং অসমারিক নাগরিকদের লুঠ করার মধ্য দিয়ে। ১৮৫৮-র মার্চে বৃটিশের লক্ষ্ণৌ লুঠের সাক্ষী ছিল London Times-এর William Russell। বিদ্রোহে ধৃত একজন মারাঠী তীর্থযাত্রী একইরকমভাবে ঝাঁসী ও পার্শ্ববর্তী স্থানে বৃটিশের দ্বারা ঘটিত মহিলা ও শিশুসহ অসামরিক নাগরিকদের হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিয়েছিল।

অত্যাচার বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পরও চলেছিল। তখন ছিল অনুসরণ, আদালতে বিচার এবং বধ করা। পরে জমি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। কেবলমাত্র একা বিদ্রোহীরা নয়। তার সমস্ত পরিবার, যার সদস্যদের বিদ্রোহে যে কোনরকমভাবে জড়িত থাকার সন্দেহে জমি থেকে বঞ্চিত করা হত। বাজেয়াপ্ত জমিগুলি বৃটিশ পরিবারদের দেওয়া হত এবং সেই রকম দেশীয়দের দেওয়া হত যারা তাদের স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে কাজ করার দাবী করতে পারত।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পুরোপুরি পরাজয় মনে করা হয়েছিল এবং পরিণতি হিসাবে বৃটিশ শাসনের অত্যাচার এবং শোষণের চরিত্র আরও নগ্নরূপে দেখা দিয়েছিল। নিজেদের পরাজয় সত্ত্বেও, বিদ্রোহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আঞ্চলিক বৃদ্ধির নীতি চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তিকে দুর্বল করেছিল, যেহেতু তারা বিদেশে অভিযানের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের উপর আর আস্থা রাখতে পারত না। ১৮৫৭ সালের পূর্বে, তিনটি প্রেসিডেন্সীতে ২,০০,০০০-এর বেশী ভারতীয় সিপাহী ছিল। এই সংখ্যা ১,২১,০০০-তে কমিয়ে আনা হল ১৮৬২-৬৩ সালের মধ্যে, যখন ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা ৩৮,০০০ থেকে ৭৬,০০০-তে বৃদ্ধি করা হয়েছিল যাতে করে একজন ইউরোপীয় সৈন্য দুজন ভারতীয় সিপাহীদের উপর নজর রাখতে পারে। এর ওপর ভারতীয়দের পদাতিক শাখার বাইরে রাখা হয়েছিল। কারণ ইউরোপীয় সৈন্যদের মাহিনা কয়েকগুণ বেশী ছিল ভারতীয় সৈন্যদের থেকে, ফলে সাধারণ করদাতাদের কাঁধে সামরিক খরচের বোঝা আরও বেশী করে ফেলা হল। যদিও সৈন্যরা খুব কমই কার্যকরী ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ভারতীয় সৈন্যকে কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার মহান পরিকল্পনা আর বেশীদূর একই আবেগে অনুসরণ করতে পারেনি। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ বৃটিশ আক্রমণের থেকে অনেক সময়ের জন্য এশিয়ার অন্যান্য দেশকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল।

শেষ মুঘল রাজা বাহাদুর শাহ ১৮৫৭-র বিপ্লবের কেবলই একজন বীর ছিলেন না। তিনি একজন কবি ছিলেন, তাঁকে বিচারে পাঠানো হয়েছিল, বন্দিদশায় কাগজ ও কলম থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তিনি তার বন্দীগৃহের দেওয়ালে চারকোলের সাহায্যে মহান বিদ্রোহের মর্মান্তিক পতনে তাঁর বিষন্নতা ও দুঃখের কবিতা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর অনেক কবিতা ১৮৬২ সালের ১৪ই জুনের Political Agent of Bhopal রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের গায়করা গান গেয়ে শোনাত।

সমস্ত বাতাস যেভাবে হঠাৎ বদলে গেল
আমার হৃদয় তোলপাড় হয়ে উঠছে
কিভাবে ভুলবো সেই সন্ত্রাসকাহিনী
যা চুরমার করেছে আমার বক্ষদেশ
কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায়
ধ্বংস হয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ
যুদ্ধজয়ীর দল
যাকে সামনে পেয়েছে
হুঙ্কার ছেড়েছে—
‘তোল্ শালাকে হাঁড়িকাঠে’
একজনও শেষশয্যা পায়নি মাটির নীচে
একটুকরো কফনও জোটেনি কারো
কেউ শেষপর্যন্ত জন্মভূমিতে পৌঁছতে পারেনি
এমনকি কোথাও
কোনো মৃত্যুর
কোনো সমাধির
চিহ্নমাত্রও রইলোনা

আমার বন্ধুরা, শোনো

আমিই সেই নিহত মানুষ
যার নৃশংস লাশের সামনে ঝুঁকে পড়ে
যুগপৎ দুঃখে ও ঈর্ষায় চিরকাল
গোটা পৃথিবীকে বলতে হবে—

হে জাফর
যতদিন ভারতবর্ষ বেঁচে থাকবে
এই ফুল নক্ষত্রগৌরবে ফুটে থাকবে

তাঁর গানের লাইনে মৃত বিদ্রোহীদের গৌরব গাথা ছিল। এটা ভারতের জনসাধারণের জন্য যে, তারা ১৫০ বছর পরে কীভাবে বীরদের স্মৃতিকে রক্ষা করবে, যারা তাঁর জন্য বীরের মৃত্যু বরণ করেছিল।

অনুবাদক ঃ গদ্যাংশ - দেবকুমার মিত্র, পদ্যাংশ - পল্লবরণ পাল

## • Tribute to Dr K. Krishnagopal—*R. Jeyapriya w/o K. Krishnagopal*

It is with pride accompanied by a deep sense of loss and sadness that I have undertaken the responsibility of sharing the brief but purpose-filled life of my husband whom I lost in a tragic accident last year. Dr. K. Krishnagopal, exemplary student, filial son, steadfast friend, indulgent husband, doting father, dedicated doctor, inspiring mentor, the perfect complete gentleman...

While the trauma of this unexpected tragedy is still fresh in our minds what continues to inspire us is the way in which he had always led his life by example based on the principles of truth, sincerity and discipline with a generous dose of compassion, warmth and humour.

He always knew he wanted to become a cardiac surgeon and steadily worked to achieve his goal, qualifying at every stage entirely through merit. His focus on his professional ideals, especially with regard to providing quality cardiac care to the masses saw him shift from UK and Singapore to Chennai and ultimately to Madurai, which is easily accessible and affordable for the multitude of rural folk living further down South. Credit for his innate service-mindedness goes to my parents-in-law, a humble and dedicated doctor couple who chose to set up their medical practice in Theni, a rural town rather than a city, so as to better meet the medical needs of the vast population in the surrounding villages.

Ever the dynamic go-getter, Dr Krishnagopal's innovative spirit manifested itself through the various programs and ideas initiated by him, always with the aim of benefiting his patients. He became known as "the magician", as he was affectionately known by some of his patients, for his ability to undertake critical and complicated surgeries successfully. As demonstrated in the case of the 6 year old child with Kawasaki disease who underwent quadruple bypass surgery, making him the youngest patient in India to have undergone this complex procedure.

KG, as he was popularly known, was also a committed teacher and mentor, often taking classes for nurses and other paramedical staff, training junior surgeons and inspiring many young doctors to undertake this precise and strenuous specialty.

26th December 2009 is a day forever etched in our memory as one filled with intense shock and sorrow. A sudden phone call drastically changed the course of our lives and saw us rushing to the ICU at Vadamalayan Heart Foundation in Madurai to see the still and heavily bandaged form of my husband. This was in direct contrast to the happy and vibrant person who was meant to receive us the next morning to embark on our Christmas holidays. Having sustained grievous injuries to his skull, my husband lay in his ICU, admitted as the 401st patient, following 400 patients whom he has successfully operated and discharged.

Despite battling for his life over the next few days, surrounded by the best medical attention available, managed 24/7 by his friends, colleagues, professors and his dedicated staff, he irrevocably slipped into a state of brain death. After fighting disbelief and overcoming denial at the horrific truth, it became clear what had to be done. There had to be some purpose to the meaningless loss of such a young and energetic person with so much unfulfilled potential.

It was now in our hands to salvage the situation and create a lingering tribute to the memory of Dr Krishnagopal by offering the most precious gift of all to another human being – life and hope.

My husband and I had always discussed our conviction on the merits of organ donation; in fact both of us had filled in organ donation cards at one point of time. Furthermore, my husband was in the process of procuring permission for his hospital to engage in organ harvesting from donors, in order to start the first heart transplant unit in South India,

outside of Chennai. He already had a list of recipients who were in desperate need of heart transplants but were unable to afford the cost of the operation in city centres. His dream did come true, tragically at the cost of his own life!

It is very difficult to conclude at any point of time that nothing more can be done and accept the inevitable… We had to overcome our insecurities and give him back his dignity; to release him from his irreversibly injured earthly form and preserve our memory of him as a vital, productive and gifted individual. Once there was unanimous consent, it became a time-bound challenge to set in motion the sequence of events which had to happen with clock-work precision.

Since he was not in a condition to be shifted to a hospital which had permission for organ harvesting, special clearance was quickly sought from the relevant government agencies to accelerate the original application of approval for Vadamalayan Hospital to harvest organs. This was not an easy task to accomplish on the eve of New Year with many officials having gone on leave. Once the consent was summarily faxed across, organ harvest teams who were on stand-by jumped into action to determine the feasibility of the organs to be harvested. The heart and kidneys were found to be healthy and suitable, and more importantly, with available recipients who were determined to be compatible matches.

As perfectly as he handled others' hearts, so too was his own heart handled with all care by his colleagues and surgical team, who transferred it to a special double-walled sterile ice-box. It was hand-carried to the waiting plane, the very flight he had so often flown in to come home to us…. Upon reaching Chennai, the Tamil Nadu traffic police arranged for a green corridor, enabling his heart to reach the hospital in record time. When the clock struck 12 that night, heralding a New Year, his heart was beating strong, infusing fresh blood and enabling the recipient to look forward to a new lease of life.

In other countries with more developed organ donation programs, confidentiality is strictly maintained and the donor families do not know the identity of the recipients. We are yet to enforce and maintain such protocols – thus I do know in whom and where my husband's heart beats and I'm glad to note that he is doing well and is receiving financial assistance for the expensive immune-suppressant medication which is so crucial in the first year, post-transplant, to avoid rejection of the donated organ. My message to him is to value and utilize this second chance, to create a more meaningful life for himself and for those around him.

Even after my husband's physical absence he has left the powerful message of organ donation by which he touched the lives of 3 critically ill patients who received a fresh lease of life from his heart and kidneys. Memories of his life continue to teach us and his enduring lesson to one and all is clear: '***Be the change you want to see'***, a maxim of Gandhiji which he embraced and demonstrated throughout his brief yet exemplary life.

I feel proud to have been given the opportunity to demonstrate his ideals of selfless service to humanity through the gesture of donating his organs. There could have been no other fitting tribute to a doctor and humanitarian than to extend his life's philosophy, even beyond his passing these earthly boundaries.

What are the different reservations and apprehensions that the donor family faces in the absence of previous discussions and informed consent?

Moral, ethical, social and religious objections are to be expected. Each overlaps the other with the basic question being "**Is it right?**" for the departed soul. Once the spark of life ends, what is this body but an empty shell, why should we attach sentiment to a body which can no longer move, feel, think and respond? But think about this....If the eyes could see again, if the heart could beat again,

if the various organs could function usefully, each helping so many to improve their lives in turn, can there be a greater tribute than this to keep our loved ones alive and their memory valued? Can there be a higher salvation than to offer a new lease of life to a stranger with no expectation in return? Is there a higher purpose to burning or burying our mortal remains when the same healthy organs can extend a life which may potentially be another Dr Abdul Kalam, a Mother Teresa, a Mahatma Gandhi or a Rabindranath Tagore?

Like a powerful supernova which flashes its brilliance just for a second, Dr Krishnagopal's life illuminated everyone's around him. Let us keep that flame burning by committing to and advocating organ donation and spread the awareness of its benefits. It is the final selfless act which every person is capable of… the choice is yours alone.

**Dr. K. KRISHNAGOPAL**

The perfect gentleman

The dedicated doctor

## ● আমার রবীন্দ্রনাথ—*পারমিতা*

কখন প্রথম দেখেছি আমি
কখন তাকে প্রথম বুঝেছি আমার মধ্যে
কখন প্রথম প্রভাব পড়ল
অন্তত আমি কিন্তু মনেই করতে পারিনা।

তখন আমি ছয় বছরের, ক্লাস ওয়ানে পড়ি। শিশুতীর্থের ক্লাবে বিকেলে সবাই প্যারেডে যাই, ব্রতচারী করি, আরও কত কি। সেবার শিশুতীর্থের রবীন্দ্রজয়ন্তী, সবাই বলল আমিও নাকি কবিতা বলব। তোতাপাখী তৈরী হল - সন্ধ্যায় চটের কাপড়ে প্যান্ডেলে কবিতা বলতে গিয়ে ভুলে যাওয়া। তারপর সেই গানটা—'আয় তবে সহচরী' নাচতে মঞ্চে উঠে ছোট বোনকে বললাম আমার গায়ে লাল আলো পড়েছে। ব্রাহ্মণ গল্প অবলম্বনে ঋষিপুত্র - সব্বাইকে মা শিখিয়েছিলেন - মা বলেছিলেন 'আশ্রমের সবাই চোখ বন্ধ করে রাখবে' আমি পিটি পিটি করে চোখ খুললাম - হল তো অন্ধকার, আমিও দেখার চেষ্টা করলাম কাউকে দেখা যায় নাকি। এই অবোধ বয়সে পড়েছিলেম বা বলা যায় শুনেছিলাম, জবালার পুত্র সত্যকাম সে নাকি গৌতম ঋষিরই পুত্র- কি জানি কি মানে — এখন ভাবি কোথায় এর তাৎপর্য।

সবার মত গলা জোর করে গান করা — বুদ্ধপূর্ণিমায় 'পূজারিনী', ২৫শে বৈশাখে 'হে নূতন', বৃক্ষরোপনে 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' কিংবা Eye-camp-এ 'অন্ধজনে দেহ আলো' থেকে ১৫ই আগস্ট— 'ও আমার দেশের মাটি', 'পূজোর গন্ধে শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', এমনকি ২৫শে ডিসেম্বরে 'একদিন যারা মেরে ছিল তারে গিয়ে', সবই-সবার মত করে শিখে ফেলেছি। শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা কিংবা লীলা-ঋষিকুমার-শান্তা, এদের সাথে তো স্কুলেই পরিচয় হয়ে গেছে - মুখে মুখে গান আর অংশবিশেষ পাঠ।

ধীরে ধীরে যখন বয়সটা বাড়ছে - তখন শেষের কবিতা যেমন ভালো লাগে, রাজা বোধহয় ততটাই নিজের মনে হয়, অণুরণনে উঠে আসে চোখের বালি থেকে শাস্তি, কিংবা পুনশ্চ থেকে বলাকা। কখনও আমিই মালতী আবার আমিই ক্যামেলিয়া, আমিই নন্দিনী আবার আমিই দামিনী।

আমি ঠিক জানি না শুরু কেমন। তেমনি জানিনা প্রবাহের কারণ। কিন্তু তুমিই আবার সবে জ্ঞানে অজ্ঞানে একদম হাজির। এমন কোন অনুষ্ঠান নেই কোথাও তুমি বাদ পড়। আবার এমন কোনো মুহূর্ত নেই তুমি ভাবাও না। সেবার আশীষদের অনুষ্ঠানে আমাকে বলেছিলো "ঐ রবি ঠাকুরের চচ্চড়িটা বাদ দিয়ো"। কি রাগ, সমস্ত অনুষ্ঠানটায় কিছুই বলতে পারিনি। শুধু গুম হয়ে বসেছিলাম। তোমার সমস্ত লেখা আজও আমার পড়া হয়নি। তোমার সমস্ত গান আজও শোনা হয়নি। তোমার সমস্ত কথা আজও বোঝা হয়নি। তবু আমার আনন্দে তুমি, দুঃখেতো আছোই, এমনকি ভালোবাসাতেও তুমি, অহংকারেতেও তুমি। বলতে পারি সকাল থেকে রাত। রাতের ঘুমের, কিংবা ঘুমের পরে ভোরে কিংবা বেলা বাড়বার কাছে অথবা প্রচণ্ড ঝড়ে বৃষ্টিতে খুব গরমে, কনকনে শীতে। তুমিই আমার প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের কেন জানিনা—সবসময়েরই। যেখানে বাঁধা নেই—যেখানে কিছু কম নেই—যেখানে কিছু—হারাবার নেই।

## সার্ধশতবর্ষে প্রণাম

# সার্ধশতবর্ষে প্রণাম

## ● বাঙালী রসায়ন বিজ্ঞানী— *অমিত হবিষ্যাসী*

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের এক স্বনামধন্য ছাত্র। তিনি একজায়গায় লিখছেন 'প্রেসিডেন্সি কলেজে ৩য় বর্ষে ভর্ত্তি হয়েছি, ১১টা থেকে ১২টা অবধি ক্লাস ছিল, ঘণ্টা বাজল, সবাই দৌড়ে গিয়ে সামনে বসার চেষ্টা করলাম, ২য় ঘণ্টা বাজল বেয়ারা রেজিস্টারি হাতে ঢুকল, টেবিলে তা রেখে পাশে দাঁড়াল, সকলে উদগ্রীব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছি, হাসিমুখে প্রবেশ করলেন অধ্যাপক মশাই। বিলেত ফেরৎ অথচ টাই বাঁধা নেই। গলাবন্ধ একটা কোট পরা, কোটটা সুতির সাদাকালো, চৌখুপি ওয়ালা ছিটের জামা, অবিন্যস্ত চুল, অযত্নে বর্ধিত গোঁফ দাড়ি। নজরে এল বেয়ারাটার গায়েও একই রকমের কোট, মোহিত হয়ে ক্লাস করলাম কিন্তু বুঝতে তখনও পারলাম না অধ্যাপক ও বেয়ারার একই কোট হল কি করে। বিকালে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে কথাটা পাড়লুম গুপীবাবুর কাছে। হাসতে হাসতে উনি বললেন আসলে একটা থান কিনে চারটি কোট করিয়েছিলেন অধ্যাপক মশাই, ২টো বেয়ারাকে দিয়েছেন আর দুটো নিজে পরেন।'

বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলায় ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এই প্রবাদপ্রতীম বিজ্ঞানী অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রথমে হেয়ার স্কুলে পরে অ্যালবার্ট স্কুলে পড়া শেষ হলে ভর্ত্তি হন বর্তমানের বিদ্যাসাগর কলেজে। ১৮৮৬ সালে BSc ও ১৮৮৭ সালে DSc ডিগ্রী পান লন্ডনের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৮৮৮ সালে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে সাহেবী পোশাক ছেড়ে ধুতিচাদর পরে বাঙালী সাজলেন। এই সময়ে যে বন্ধুর কাছে তিনি সর্বপ্রথম সাহায্য পান তিনি হলেন আর এক জগৎ বিখ্যাত মনীষী আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস। তখনকার রেওয়াজ ছিল বিদেশে থাকাকালীন সকলে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেশে ফিরতেন, তা না করায় ভুগতে হয়েছিল আচার্য প্রফুল্ল রায়কে, ১৮৮৮-এর আগস্ট থেকে ১৮৮৯-র জুন পর্যন্ত বেকার ছিলেন বিজ্ঞানী রায়। অবশেষে একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে গ্রহণ করতে হল প্রেসিডেন্সি কলেজের মাসিক ২৫০ টাকার সহকারী অধ্যাপকের (im classified post) পদ। অতি দ্রুতই 'বিলেত ফেরত' তকমা থেকে বেড়িয়ে এসে সকলের সাথে মিশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোকে চিত্তাকর্ষক করে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে উনি হয়ে উঠলেন দক্ষ অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সীতে তখন দুই বাঙালী জগদীশচন্দ্র বোস ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কাছে বিজ্ঞানের পাঠ শুরু হবে এই আশায় বহুছাত্র ও তাদের বন্ধু বান্ধবের ভিড়, এভাবেই ছড়িয়ে পড়ল অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম দিকে দিকে।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানজগতে। মারকিউরাস নাইট্রেট হল তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আবিষ্কার। বিদেশী তাবর তাবর বিজ্ঞানীরা যখন পদার্থটির অস্তিত্বই জানেন না তখন বাঙালী বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কার বিশ্বের দরবারে আলোড়ন তুলে দেয়। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে প্রফুল্লচন্দ্র লাভ করেন যশ ও খ্যাতি কারণ পরাধীন ভারতে তখন মনে করা হত পাশ্চাত্য থেকেই কেবল সবকিছু শেখা ও জানা যায়। এছাড়াও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সালফোনিয়াম হ্যালাইড, অ্যান্টিমনি হ্যালাইড, সোনা ও রূপোর যৌগ, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, মারক্যাপটান মূলক এবং জৈব সালফো মূলকের আবিষ্কার সর্বজনবিদিত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের 'ঘুড়ির পরীক্ষা' ও তাঁর আত্মজীবনী দ্বারা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এই মনীষী ছিলেন ভারত তথা এশিয়ার বিজ্ঞানজগতের অগ্রদূত। অনুপযুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিল্পে রসায়নকে ব্যবহার তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। ভারতীয় দরিদ্র রোগীদের থেকে বিদেশী কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা রোধে তিনি ১৯০১ সালে রাসায়নিক শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। কার্ত্তিক বোস, ভোলানাথ পাল, চন্দ্রভূষণ ভাদুরী, চারুচন্দ্র বোস-র আন্তরিক সহায়তায় ৫০,০০০ টাকা দিয়ে প্রথমে Upper Circular Road-এ শুরু হয় "Bengal Chemical" নামক শিল্প সংস্থার কাজ। পরে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের আর্থিক সহায়তায় ৩ একর জমির পর মানিকতলায় এর শাখা তৈরি হয়। কিছুকাল পর সোদপুরের পানিহাটীতে ৬০ একর জমির উপর সৃষ্টি হয় ভারতের অন্যতম সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের কারখানা আচার্যদেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে, এরপর কানপুর, মুম্বাই ইত্যাদী ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে একেরপর এক শাখা খুলতে থাকে। ১৯৮০ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল দুর্বল হওয়ার পর ভারত সরকার একে সরকারীকরণ করে প্রচুর আর্থিক সহযোগিতায় (৪৪০ কোটি) এর উন্নতির চেষ্টা করে। গত বছরে ৮৩ কোটি ও চলতি বছরে ১৫০ কোটি টাকা turn over হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষাদরদী একজন প্রকৃত শিক্ষক, তার স্বনামধন্য কয়েকজন ছাত্রেরা হলেন জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে রসায়নের উন্নতি ব্যাখ্যা করতে তিনি ১৯০২ সালে লেখেন "A History of Hindu Chemistry from the earliest times to the 16th century"। তার আরও বিখ্যাত লেখার মধ্যে পরে তার জীবনকথা "Atma Charit" এবং "Life and Experience of Bengali Chemistry"। তিনি ছিলেন "Indian School

of Chemistry" এবং "Indian Chemical Society"-র জনক। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে।

ছোটবেলায় শারীরীকভাবে তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল। এবং এই কারণে ২ বছর তিনি সাসপেন্ড হয়ে যান স্কুল থেকে, ইত্যবসরে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার চর্চা করেন পুরোদমে, তাঁর সাহিত্যচর্চাও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। সাহিত্যে তাঁর আকর্ষণ ছিল উল্লেখ্য। শেকসপীয়ারের নাটক, রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের কবিতা ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। দুবার বাংলাসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করতেন যে ছাত্ররা কেবল BSc/MSc ডিগ্রী পেলেই চলবে না বরং দরকার প্রকৃত জ্ঞান। তার ভাষায় 'ডিগ্রী কেবল চাকরীর জন্য লাগে, এর বাকী কোন মূল্য নেই।'

'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও স্বদেশী বস্ত্র পরিধানকে তিনি বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন।

ছাত্রদের টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পূর্ণমাত্রায় ব্যবসায়ে পদার্পণকে জীবনের লক্ষ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সাদামাটা চাকরী জীবন ছিল তার একদম না পসন্দ, বরং ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রত্যেককে তিনি আগ্রহী করতেন এবং নিজেই ব্যবসায়ী হিসাবে বাংলাকে উপহার দেন "Bengal Chemical & Pharmaceuticals"।

কয়েকটি তাৎক্ষণিক ঘটনা না বললে আচার্যদেবের সম্পর্কে তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন—

উনি এক জায়গায় বলছেন 'যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার বর্ষকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সম্ভার সঞ্চয় করিয়াছি? প্রাচীনকালের কর্নেলিয়ার কথায় আমি উত্তর দিব—... রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেখাইয়া বলিতে পারি এরাই আমার রত্ন—এ থেকে তার ছাত্রবৎসল ও চিন্তাভাবনার উৎকর্ষতা ধরা যায়। জৈষ্ঠ্যমাস, ভীষণ গরম, সকাল থেকে গুমোট করে আছে, সকাল ৮টার কাছাকাছি, সতীশ মিত্র (প্রেসিডেন্সীর এক নামী ছাত্র) বললেন— আচার্য্য দেবকে একটু দেখে আসি ঘর খোলা, অবারিত দ্বার, যার যখন ইচ্ছে যাওয়া আসা করে, ঘরে ঢুকে দেখা গেল তিনি শুয়ে শুয়ে শেকসপীয়ার পড়ছেন'—কথাবার্তা কিছুক্ষণ হওয়ার পর ঘর থেকে বেড়িয়ে সতীশ বললেন ঘরে তো পাখা নেই, মিস্ত্রী ডেকে কালই একটা পাখা টাঙিয়ে দিয়ে যাব। হঠাৎ কি মনে করে ওনাকে বিষয়টার অনুমতি নিতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা, দমাস করে পিঠে একটা কিল মেরে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন এটা কোন দিক্? দেখা গেল দক্ষিণ দিক, মানে না বুঝে সতীশ অবাক হয়ে তাকালে উনি বলতে লাগলেন—'দরজা খুলে রাখলে প্রচুর হাওয়া, পাখার কোন দরকার নেই'। অর্থাৎ দক্ষিণমুখী দরজা থাকলে ঐ ঘরের কোন পাখা লাগে না—ঘটনাটি জানারপর আজও আমাদের রীতিমত লজ্জা লাগে।

রবিবারের দুপুর, পরীক্ষাগার বন্ধ, ঘরেই রয়েছেন, ছোট্ট ঘরটায় কুকারে তার রান্না হচ্ছিল, সামনের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলে জানলাম—ভাত, মুশুরির ডাল, আলু সিদ্ধ। কথাটা কানে যেতেই আচার্যদেব এগিয়ে এসে বললেন 'মাখন দিয়ে আলুসিদ্ধ খেয়েছ? চমৎকার। একেবারে অমৃত, আমি মাঝে মাঝে খাই।,বলে ফিরে গেলেন। 'মাঝেমাঝে খাই'-এর অর্থ রোজ সে এমনটা খেতে পারতেন না, পারবেনই বা কি করে—২৭ টাকা মাইনে, পায় সবই চলে যায় ছাত্রদের দিতে, বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর হিসাবে পাওয়া অর্থ, সেখানকার কর্মীদের ক্লাবে দিয়ে আসেন তাদের আমোদের জন্য আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে পাওয়া টাকা যায় অন্য এক প্রতিষ্ঠানে, আর বাড়তি কত টাকাই বা থাকত।'

গান্ধীজীর সাথে তার এক অপূর্ব মিল ছিল, উভয়েই প্রচুর টাকা উপার্জন করলেও সবই অকাতরে দান করেছেন তবে নিজের প্রয়োজনে দুজনেই সামান্য অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন, না হলে কি আর ঐ একটি ছোট ঘরে অত সরল জীবনযাপন আজীবন কাল বিজ্ঞানী রায় করতে পারতেন।

এই সমস্ত তাৎক্ষণিক ঘটনাবলী তার চরম বাস্তববাদীতার নিদর্শনমাত্র। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন সমাজ সংস্কারক। পরের জন্য কিছু করাই ছিল তার জীবনের অন্যতম এক আদর্শ। গরীব, বিধবা, অনাথদের বিষয়ে তিনি বরাবরই ছিলেন আগ্রহী, তার বাবার নামে রারুলিতে একটি স্কুলকে, খাদির উন্নয়নে, ব্রহ্মসমাজকে ও পীড়িতদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেন। কলেজের ছোট্ট একটি ঘরে সাধারণ পরিবেশে দিন কাটাতেন এই বিজ্ঞানী অবলীলাক্রমে। 'Department of Chemistry'কে উন্নয়নের জন্য এবং গরীব মেধাবী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি তার বেতনের প্রায় সমস্তটাই (২ লাখ মত) দান করেন।

অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, পণপথা ইত্যাদি সামাজিক ব্যধিগুলিকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদিতে বিপন্নদের জন্য 'Bengal Releif' কমিটি বানিয়ে ছিলেন এবং এদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতেন।

১৯২১ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ, ১৯২২ ও ১৯৩১ সালে বন্যাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় নিজের কলেজে ‘ত্রাণকেন্দ্র’ বানিয়ে দেশী ও বিদেশীদের নিয়ে কমিটি বানিয়ে ত্রানকার্যে তৎপর হন।

ছাত্রদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অগাধ। তিনি সর্বদা বলতেন ‘কোন মানুষ সর্বদা জয় চাইতে পারে তবে তার উচিত ছাত্র বা শিষ্যের কাছে পরাজয় বরণ করা। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থে শিক্ষক। তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান, সহজ সরল জীবনযাপন করতেন, দৈনিক খাবারে ছিল নিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা, সময় অপচয় না করা। খাদি বস্ত্র পরিধান, নিজের জামা কাঁচা, জুতা পালিশ এবং অন্যকে সাহায্য করা—এগুলি ছিল তাঁর মজ্জাগত। বহু বছর ধরে প্রত্যেক সন্ধ্যায় ২-১ ঘণ্টা করে কোলকাতা ময়দানে কাটাতেন। বন্ধু ও ছাত্রদের নিয়ে, সকলের সাথে বিভিন্ন মহাজাগতিক বিষয়ের সমস্যা সমাধান ছিল তার রোজকার সান্ধ্যকালীন কাজ। এহেন এক ব্যক্তিত্ব কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ৭৫ বছর বয়সে এবং দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে থাকা জায়গায় ৮৩ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন পার্থিব জগত থেকেই চিরদিনের জন্য অবসর নেন।

ওনার কর্মজীবন ও বিজ্ঞান সাধনা বাঙালী তথা ভারতীয় হিসাবে আমাদের প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয় আর বাঙালীরাও যে ব্যবসা বা বিজ্ঞান জগতে কিছু করতে পারে তা বার বার মনে করিয়ে দেয়। আজ তাঁর জন্মের ১৫০ বছর পর তাঁকে মনে রাখা, তার নীতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং আমাদের ছাত্রসমাজকে তাতে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের কীই বা করার আছে।

## ● প্রয়াত শিখা সাহা স্মরণে— *শ্রেয়া নন্দী*

আজ আমি প্রথম কোনো ম্যাগাজিনের জন্য লিখতে যাচ্ছি। আর সবথেকে interesting হচ্ছে বিশেষত এই বিভাগটা—‘স্মৃতিচারণা ও প্রেরণা’। এখানে লেখার সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে অবধি, মিথ্যে বলবো না, আমি ব্যাক্তিগতভাবে মৃত্যুর পরে কারোর এই স্মৃতিচারণার ধারনাটা ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। এর একটা কারণ আছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মৃত্যু হওয়ার পরে কেউ আর মৃতের খারাপ দেখেনা, মৃত্যুর পরেই একটা খারাপ মানুষও মহান হয়ে যায় আর এই ব্যাপারটাই আমি একদম মেনে নিতে পারি না।

যাই হোক, আমি হয়ত আমার বক্তব্য থেকে একটু সরে যাচ্ছি। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম, আজ আমি যাঁর সম্পর্কে লিখতে বসেছি, তিনি আমার এই ধারণাটা বদলে দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার কোনো মনগড়া কথা বলার দরকার হবে না, কোনো নেগেটিভ ধারণা বা অবস্থান গোপন করতে হবে না। আমি তাকে যতটা দেখেছি—She is just perfect.

সবার আগে, বলি তাঁর সাথে আমার ফরমাল সম্পর্কটা কি। শিখা সাহা ছিলেন আমার বাবার ছাত্র (college) জীবনের সিনিয়র বিষ্ণুভূষণ সাহার স্ত্রী। কিন্তু আন্তরিকভাবে তিনি আমার জেঠী—শিখা জেঠী।

জেঠীরা থাকতো রাঁচিতে, তাই জেঠীদের সাথে অনেকদিন পরে পরে আমাদের দেখা হতো। কিন্তু যতো কমই দেখা হোক না কেনো, তাঁর সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল ভীষণ কাছের, ভীষণ মিষ্টি। জেঠী এই বিভাগটার জন্য একজন perfect চরিত্র। যতবার জেঠীর সাথে আমার দেখা হয়েছে আমি জেঠীর থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। আমার একটা হবি আছে, আমি personality development সম্পর্কিত বই পড়তে খুব ভালোবাসি আর Jethi was a living example to understand how to build a pleasing personality.

কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘটনা আপনাদের সাথে share করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কি ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিল তার।

আমরা জেঠীদের কলকাতার ফ্ল্যাটের খুব কাছে থাকি। জেঠী যখনই কলকাতায় আসতো, সাতদিনের জন্য, দশ দিনের জন্য, যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন, জেঠী তার মধ্যেও সময় করে আমাদের সাথে দেখা করতে আসতো। সত্যি বলতে মাঝে মাঝে আমারই লজ্জা করতো, আমার মায়ের থেকেও বয়সে বড়ো একজন মানুষ এতদূর থেকে এত অল্প সময়ের জন্য এসেও আমাদের সাথে দেখা করতে আসে আর আমি এত ব্যস্ত যে আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতে পারি না। সম্পর্ক কিভাবে ভাল রাখতে হয়, সেটা জেঠী খুব ভাল জানতো। আমি আমাদের থেকে বয়সে বড়ো অনেকের মুখেই এ কথাটা খুব শুনি ‘আমি তো ওর থেকে বয়সে বড়, ওরই তো যোগাযোগ রাখা উচিত।’ জেঠী একেবারেই এরকম ছিল না। রাঁচী থেকেও বেশীর ভাগ সময় জেঠীই ফোন করতো।

একটা কথা, আমি একজন মহিলা হয়েও স্বীকার করছি, আমরা অনেকে মিলে আড্ডা মারা মানেই হলো, কিছু সময়

গেলেই সেই আড্ডার মুখ্য বিষয় হয় 'পরনিন্দা পরচর্চা'। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যেতাম, যখন জেঠীর সাথে বসে আমি, মা, কাকিমা ২-৩ ঘন্টা ধরে আড্ডা মারতাম তখন একবারের জন্যও কারোর নামে কোনো কথা উঠতো না। একদম নির্ভেজাল আড্ডা, এমন আড্ডা যা মন ভালো করে দেয়, এমন আড্ডা যা মনের মধ্যে কোনোরকম তিক্ততার জন্ম দেয় না।

জেঠীর আরো একটা দিক আছে, যেটা আমি জানাতে চাই সেট তার creativity-জেঠী অসাধারণ রান্না করত। তার সেই রান্নার নমুনা তো আমি কোনোভাবেই আর আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবো না, তবে তার একটা অসাধারণ শিল্পীসত্তাকে আপনাদের কাছে পৌঁছতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। তাকিয়ে দেখুন তাঁর হাতের কাজ, কি নিখুঁত সেলাই, কি ভয়ঙ্কর মনসংযোগ থাকলে একটা মানুষ এমন জিনিস তৈরী করতে পারে।

আমি আমার এই স্মৃতিচারণাটা শেষ করতে পারব না, যদি না আমি বিষ্ণু জেঠু আর জেঠীর relation সম্পর্কে আমার উপলব্ধিটা আপনাদের সাথে share করি। জেঠী চলে যাবার পর বিষ্ণুজেঠু যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন বেশ কিছুটা সময় আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আর সবচেয়ে বড় কথা সেই সময়ের বেশী অংশই জেঠু জেঠীর কথা বলছিলেন। যে যে ঘটনা জেঠু আমাদের সাথে সেদিন খুব উৎসাহ নিয়ে share করছিলেন সেগুলো হয়তো একজন মানুষের life-এ খুবই unimportant কিন্তু সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা বারেবারে বলে দিচ্ছিলো যে বিষ্ণুজেঠুর জীবনে she was so important or I should say still she is.

জেঠী ছিল সম্পূর্ণ এক people person! আমি তাকে ভালোবাসি, respect করি। বিষ্ণুজেঠু আমায় বলে জেঠী আমার হাতের রান্না খুব পছন্দ করত। This is a huge complement for me. কিন্তু এর থেকেও বড় পাওনা হল—বিষ্ণু জেঠু আমায় বলেছেন যে, জেঠী বিশ্বাস করত যে তার চার মেয়ে—অর্পিতাদি (জেঠীর বড় বৌমা), জয়িতাদি (জেঠীর ছোটো বৌমা), রাঁচিতে জেঠীর প্রতিবেশী একজন আর আমি। এই পাওয়াটা যে আমার কাছে কতটা সেটা বোধ হয় আমি চেষ্টা করলেও প্রকাশ করতে পারবো না। আজ আমার জীবনের খুব vital একটা moment-সামনেই আমার বিয়ে। এইসময় প্রত্যেকটি মেয়েই খুব nervous থাকে যে কি করে শ্বশুরবাড়িতে Adjust করবে, সবার সাথে ভালোভাবে মিলেমিশে থাকবে, সবার কাছে নিজের একটা জায়গা করে নেবে। আর এই জন্য তাদের মায়েরা সারাক্ষণ তাদের suggestion দেন---How to build up a good relationship and how to maintain it. কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমার মা আমাকে বলেন—জেঠীর কাছ থেকে যা শিখেছ, তাই করো।

আজ এই মুহূর্তে জেঠীকে খুব miss করছি, শুধু আমি না, আমাদের পুরো family-ই miss করছে। জেঠী আজ থাকলে এই অনুষ্ঠানটায় ভীষণভাবে involved থাকতো। আজ আমাদের আর কিছুই করার নেই, কিন্তু তাও একটা কথা বলতে চাই—**I love you and miss you, Jethi......**।

# পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন একটি বিকল্প

## ● Temper কারখানার চোখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ—*পর্ব-৩, বিষয় - স্বউদ্যোগ, দ্বিতীয় অংশ*

**সূচনা ঃ**

বিষয়টির প্রথম অংশে স্বউদ্যোগের এক ভিন্ন মডেলের সম্ভবনার অনুমান করা হয়েছিল। এই সম্ভবনাকে বাস্তবায়িত করার একটা রূপরেখা দেবার চেষ্টা করব আমরা এই পর্বে, আমাদের মিলিত অভিজ্ঞতার আলোকে। আমাদের সীমিত ক্ষমতায় স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণতা থেকে অনেক দূরেই শেষ করব। তবুও চেষ্টা করতেই হবে কারণ বিকল্প মডেলের মধ্যেই আমাদের মত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমরা জীবনের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে পারছি রাজ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দগুলি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে এবং খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে বিগত কয়েকবছর। একে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ফলে রাজ্যে স্বউদ্যোগের যে সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা কঠিন বাধার সামনে পড়েছে, আশঙ্কা হতে শুরু করেছে এর ভবিষ্যত নিয়ে।

দ্বন্দগুলি শত্রুভাবাপন্ন হবার কারণগুলিকে যদি আমরা কিছুটা বুঝতে পারি তাহলে মনে হয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বাড়বে। লেখাটির প্রথম অংশে প্রাথমিক পর্যালোচনায় আমরা দেখেছিলাম কৃষি ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি স্বউদ্যোগীদের হাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী রয়েছে আমাদের রাজ্যে। বর্তমান একমেরু বিশ্বে এটা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিপুঁজির অধুনা সবচেয়ে আগ্রাসী অংশটি হল ভাসমান পুঁজি বা floating capital, যা মুষ্টিমেয় কয়েকটি বহুজাতিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভারতবর্ষের মত দ্রুত বিকাশীল অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ করতে এই আগ্রাসী পুঁজিগুলির নিয়ন্ত্রকরা স্বাভাবিকই আগ্রহী থাকবেন। বাধা এলে নানান আগ্রাসন এরা করবেন প্রয়োজনে নৈতিকতাকে উপেক্ষা করেই। এই 'ভাসমান পুঁজি' সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তিগুলিকেও প্রয়োজনে বন্ধ করে দিচ্ছে নিজেদের দ্রুত মুনাফার জন্য। ফলে ফাটকাবাজি ক্রিয়াকলাপ বা বুদ বুদ অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বিশ্বায়নের পরিণতিতে পুঁজির পুঞ্জীভবন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিশ্বব্যাপী বাজারের নিয়ন্ত্রণ আরও বেশী করতে বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি সংযুক্তিকরণ ঘটাচ্ছে, অন্য প্রতিযোগী তুলনায় ছোট বা দুর্বল শিল্প অধিগ্রহণ বা দখল হচ্ছে প্রভৃতি পুঁজির পুঞ্জীভবনের প্রয়োজনে আগ্রাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ উন্নত দেশগুলির মাত্র কুড়ি শতাংশ মানুষ সমগ্র বিশ্বের উপার্জনের পঁচাশি শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। আর অপরদিকে নীচের তলার কুড়ি শতাংশ বিশ্ববাসীর হাতে যাচ্ছে মাত্র উপার্জনের ০.৩ শতাংশ ভাগ। এই বৈষম্য বিশ্ব আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। ভারতবর্ষে এই আগ্রাসী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ বিলিওনিয়ার (অর্থাৎ ৪৫০০ কোটি টাকার বেশী সম্পত্তির মালিক)-এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪ সালে ছিল ৯ জন, ২০১০ সালে হয়েছে ৪৯ জন। এই বিলিওনিয়ারের সর্বোচ্চ পাঁচ জনের মোট সম্পদের পরিমান নিচের তলার ৩০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের সমান। মনে হয় এই অসাম্যের ফলেই দ্বন্দগুলি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসী এর প্রতিকারের পথ খুঁজছেন যাতে দ্রুত বিকাশের ফলাফল গরিষ্ঠাংশ ভারতীয়কে উপকৃত করে, অসাম্য হ্রাস পায় ফলস্বরূপ দ্বন্দগুলি তুলনায় প্রশমিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য, ফলে কৃষি ও শিল্পের বিকাশে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত কেন্দ্রীয় সরকার স্বাভাবিক রাজনৈতিক কারণেই সহজে স্বীকার করবেন না। ফলে এর বিকাশে প্রতিকূল পরিস্থিতি শুরু থেকেই ছিল তার মাত্রা বিগত কয়েক বছরে লগ্নি পুঁজির অবাধ বিচারণের স্বার্থে অনেকটাই বেড়ে গেছে। আর রাজ্যে যাঁরা এই ব্যতিক্রমী সম্ভবনাকে বাস্তবায়িত করবেন সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরাও ক্ষেত্রবিশেষে আত্মসন্তুষ্ঠিতে ভুগেছেন কখনও, আবার কখনও পুঁজি বিনিয়োগের দৌড়ে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেদের সঠিক অবস্থান ঠিক করতে নানান বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ফলে মানুষের একাংশের আস্থা হারিয়েছেন। যদিও যা প্রচার হচ্ছে বাস্তবে চিত্রটা অনেকটাই ভিন্ন। সঠিক অবস্থা বুঝে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে হবে যাতে গরিষ্ঠাংশ মানুষের স্বার্থে কৃষির মত শিল্পের বিকাশে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্দ্যোগগুলিকে রক্ষা করে বিকাশের মূল ভারকেন্দ্রে পরিণত করা যায়।

**প্রধান দুটি শর্ত ঃ**

**ক)** কৃষি থেকে শিল্প, এই মানবসভ্যতার বিকাশের রাস্তাটা আমাদের মত জনবহুল উন্নয়নশীল (Developing) দেশে উন্নত (Developed) দেশগুলির অনুকরণে হওয়া সম্ভব নয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলিতে যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিল্পোন্নতি হয়েছিল তাতে ভারতসহ ঔপনিবেসিক

দেশগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কাঁচামাল, সস্তা শ্রমসহ জোগাড়ের (অবশ্যই বাধ্যতাবশতঃ) ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। ক্ষেত্র বিশেষে খাদ্যও লুঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঔপনিবেসিক দেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষে ফেলে দিয়ে। বর্তমানেও ধনীদেশগুলির মশলা, ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের সিংহভাগের জোগান যায় আমাদের মত তৃতীয় দুনিয়ার দেশ থেকে। ফলে চিংড়ি মাছ, সেরা ফল, কাজুবাদাম প্রভৃতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। এর ওপর পেট্রলের প্রাকৃতিক জোগান সীমিত হবার সাথে সাথে বায়ো ডিজেলের চাহিদা বাড়ছে। ফলে ধনীদেশগুলির গাড়ীর জ্বালানির জন্য তৃতীয় দুনিয়ার কৃষি জমির প্রয়োজন খুব দ্রুত বাড়ছে। আমাদের মত তৃতীয় দুনিয়ার দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত হওয়ার কারণে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য আন্তঃর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল হওয়া কখনওই সম্ভব নয়। দেশের খাদ্য শস্য উৎপাদন তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমাদের মত দেশে। চিন্তার বিষয় হল কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি হার বিগত দু-দশক দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের থেকে কম হয়েছে ভারতবর্ষে। বর্তমানে চিত্রটা খুবই উদ্বেগজনক, খাওয়ার জিনিষের দামের বৃদ্ধি বিগত কয়েক বছরে স্বাধীনতার পর সর্বাধিক হয়েছে ভারতবর্ষে। যদিও এবার দেশে বর্ষা ভালো হওয়ায় কিছুটা সুরাহার আশা জেগেছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে খাদ্যশস্যের মজুত ভান্ডারের গর্ব করা হয় কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার ক্ষমতা না থাকায় এই ভান্ডার গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ এর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম কিন্তু উন্নতির অবকাশকে রাজ্যের বিকাশের প্রয়োজনে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বাজার-নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় দ্রুত বাড়ছে, ফলে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। অনেকক্ষেত্রেই কৃষক নিজ থেকেই কৃষি জমি বিক্রী করতে চাইছেন। চাষ না করে ফেলে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই বাধাগুলি দূর করার ক্ষেত্রে। আমাদের রাজ্যের নিবিড় শ্রম নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাকে স্বনির্ভর করতে হবে সেচ, জৈবসার, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কৃষি যন্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার, নিশ্চিত বিক্রয় মূল্যসহ বিপনন ব্যবস্থা, উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পাঠ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষিনির্ভর শিল্পের বিকাশ প্রভৃতির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির মাধ্যমে। ফলস্বরূপ রাজ্যের মানুষের খাদ্যের ও শিল্পের প্রয়োজনীয় জোগান নিশ্চিত থাকবে। ভরপেট খাওয়া স্বাস্থ্যবান মানুষই শিল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। গান্ধীজির স্বনির্ভর গ্রামের স্বপ্ন অতীতের মত বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে আমাদের মত জনবহুল দেশে। কেবল স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রগুলি সময়ের সাথে সাথে বাড়বে এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন ঘটবে। আমাদের রাজ্যে ভূমি সংস্কার ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের দলের রাজনৈতিক খুনোখুনির বদলে সুস্থ প্রতিযোগিতা এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাম্য। মানুষকে বেছে নিতে দিন তাঁদের উপযুক্ত বিকাশের রাস্তা। শিল্পায়নের রাস্তা যেন কোন স্তরেই কৃষির প্রতিবন্ধক না হয়, বরঞ্চ শিল্পের ভূমিকা কৃষিকে দেশের মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত করার সহায়ক হবে। তৃতীয় দুনিয়ায় শিল্পের বিকাশে এটাই হল প্রধান শর্ত।

**খ)** সাধারণভাবে আধুনিক বড় শিল্পে চাকরির সুযোগ হয় খুবই কম। ফলে চীন বা ভারতবর্ষের মত জনবহুল দেশে শ্রমনির্ভর ক্ষুদ্র, ছোট বা মাঝারি শিল্পের বিকাশ ছাড়া দেশের বেকারত্বের সমাধান কখনই সম্ভব নয়। ফলে এইসব শিল্পের অন্যন্য খরচাকে একটা গন্ডির মধ্যে ধরে রাখতে হবে এবং উৎকৃষ্টতা বিচারে আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে। যেমন ১) শিল্পের জন্য উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। যাতে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গুণগতমান বজায় রেখে উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে। এই গুণগতমানের স্তর আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনীয় হতে হবে। ২) বিদ্যুৎ, কাঁচামালের জোগান, সহজ বিপনন ব্যবস্থা, পরিবহন খরচা, অর্থের জোগান, খাজনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য সরকারী নিশ্চয়তা এবং ক্ষেত্র বিশেষে সহায়তা। ৩) সঠিক জায়গায় বিভিন্ন শিল্পের তালুক গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রয়োজনীয় অনুসারী কাজের নিশ্চয়তা থাকে। ৪) শ্রম আইন এবং তার প্রয়োগের ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক দ্বন্দমূলক না হয়ে পড়ে। ৫) রাজ্যের পরম্পরাগত (traditional) যে কুশলতা রয়েছে তাকে রক্ষা করে করিগরী সহায়তা ও সচেতনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে বিশ্ববাজারের উপযুক্ত করতে হবে যেমন তাঁত, বেত, পাট, চামড়া, বাঁশ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে যেখানে মেয়েদের কাজের প্রচুর সুযোগ থাকবে। ৬) জীবন মানের রুচিশীল ও স্বাস্থ্যকর বিকাশের উপযোগী সচেতনা এবং তা নিশ্চয়তা করতে উপযোগী ব্যবস্থা। যেমন পরিশুদ্ধ খাবার জলের ব্যবস্থা, নর্দমা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা-কাঠামো, স্বাস্থ্য-কাঠামো প্রভৃতি। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী। ৭) আধুনিক বড় শিল্পের উপযোগী অনুসারী শিল্প। এই অনুসারী শিল্পের চরিত্র উন্নত দেশগুলি থেকে অবশ্যই ভিন্ন হবে। যেমন উন্নত দেশে 'ফেলে দেওয়া' (through away)

বা 'পরিবর্তনের (Replace) প্রবণতা খুবই বেশী নিজেদের অর্থনৈতিক বলের জন্য। কিন্তু আমাদের উপযুক্ত সারানো (Repair), নিবারকমূলক ব্যবস্থা (preventive) প্রভৃতি সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটাতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে স্বউদ্যোগের। ৮) বাহিরের বাজারের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীন বাজারের ওপরই মূলত নির্ভর করে এইসব শিল্পকে টিকতে হবে। ফলে আভ্যন্তরীন বাজারের ধারাবাহিক বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার উন্নতির মাধ্যমে। ৯) বিশ্ববাজার অর্থনীতির বাস্তবতাকে মাথায় রেখে তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশকে নিশ্চিত করতে হবে প্রভৃতি। দেশের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করতে শ্রমনির্ভর ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ হল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

**মূল্যবান অভিজ্ঞতা ঃ**

ক) ১৯৯১ সালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদের স্বউদ্যোগের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত করে তুলেছিল। এতটাই অনিশ্চিত যে নিজেদের ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ঐক্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। এরপর নানান ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে যখন ঘুরে দাঁড়ান শুরু হল তখন আমরা পুঁজির অভাব মেটাতে নিজস্ব মেধা ও কুশলতার বিকাশ ও সম্বনয় ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। এর ফলশ্রুতি হিসেবে এক হিট ট্রিটমেন্ট ভিতের উপর জটিল হিট ট্রিটমেন্ট নির্ভর পণ্য উৎপাদন করা শুরু হয়। উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা এমন জায়গায় রাখার চেষ্টা হয় যাতে তা সহজে বিক্রয়যোগ্য হয়। দুই Non-Destructive Testing ভিতের উপর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের যন্ত্রাংশের জীবনকালের সঠিক ধারণা ও বৃদ্ধির জন্য নিজেদের পরিষেবা ক্ষেত্রের অভিমুখকে ঘোরান শুরু হয়। (এটা প্রয়াত অধ্যাপক ডাঃ অরুণকুমার শীলের উপদেশ ছিল)। প্রাথমিক সফলতা আসে, আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে প্রত্যয়ী হই।

খ) এই নতুন রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে আবার আমরা সংকটে পড়ি নিজেদের অগ্রণী মানব সম্পদের অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ছোট উদ্যোগে এটা আজকের দিনে এক অতি কঠিন সমস্যা। বিশ্ববাজারে মানবসম্পদের মূল্য নির্ধারণের কোন মাপকাঠিই আগ্রাসী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ণ মানতে চাইছে না। সমাধানের উপায় নির্ধারণে দ্রুত মাহিনা বাড়ান শুরু হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে উন্নয়নে অর্থের ঘাটতি পরে শুরুতেই, এরপর অন্যন্য ক্ষেত্রেও অর্থের টান পড়ে। অবশেষে ২০০৫-২০০৬ সালে মাহিনাও অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং কাজের পরিমাণও কমতে শুরু করে।

গ) ২০০৬- ২০০৭ সালের শেষ ভাগে আমাদের বিদেশে একটি কাজের সুযোগ আসে পরিষেবা বিভাগে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে। জার্মান ও চীনের আন্তঃজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন সংস্থার সঙ্গে কাজের সুযোগে আমরা আস্থাশীল হই যে জ্ঞানের দৌড়ে আমাদের অবস্থা ভাল জায়গায় রয়েছে। কাজটিতে আমাদের যা দায়িত্ব ছিল তা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছিল। অর্থনৈতিক সমস্যা কিছুটা কাটান সম্ভব হয়েছিল। উন্নয়নের জরুরী প্রয়োজনগুলো মেটান হয় ২০০৭-২০০৮ এর মধ্যে।

ঘ) এর পরবর্তী সময়ে প্রতি payment থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ উন্নয়নের জন্য সরিয়ে রাখা চালু হয়। ফলস্বরূপ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের অনেকটাই মেটান সম্ভব হয়। ২০০৮-০৯ -এর মাঝামাঝি থেকে উন্নয়নের সাফল্যগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। লাভজনক কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে, সদস্যদেরও অর্থনৈতিক সুবিধা তুলনায় দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, সংস্থাটি সব মিলিয়ে তুলনায় আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।

ঙ) উন্নয়নকে স্থায়ী করতে গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বউদ্যোগ আমরা শুরু করেছি দেশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। কারণ ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের পক্ষে এই ক্ষেত্রের খরচ বহন করা একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অতীতেও বিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা হয়েছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে সাময়িক সফলতাও এসেছিল। কিন্তু আমাদের এই সফলতাগুলি থেকে স্থায়ী কিছু প্রাপ্তি হয়নি। বর্তমানে দেশের কিছু আইনের পরিবর্তন হয়েছে এবং তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে, ফলস্বরূপ নিজস্ব গবেষণা বা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আগের মত অবাস্তব বা অসম্ভব নয় বলে একটা বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে।

**পর্যালোচনা ঃ**

● রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি স্বউদ্যোগের বর্তমান অবস্থাকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ দারিদ্র্যতার সংস্কৃতি (Culture of Proverty)-র ফল হিসেবে দেখাতে চান। তাঁদের ধারণায়, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে যাতে মানুষ অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে এবং দারিদ্রতার জন্য কোন ক্ষোভ সৃষ্টি না হয়। ফলস্বরূপ রাজনৈতিক স্থিরতা থাকলেও রাজ্য সর্ব বিভাগে পিছিয়ে পড়ছে। এনারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিসহ কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক পুঁজির বিনিয়োগের মাধ্যমে পিছিয়ে পরাকে পাল্টাতে চান। এনাদের পরামর্শে বিগত কয়েক বছরে সর্ব্ববিভাগেই বৃহৎ পুঁজির কিছু অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে। আমাদের দেশে অগ্রণী রাজ্যগুলিতে

(পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাত প্রভৃতি) বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। ফলস্বরূপ শিল্পে দ্রুত উন্নতি হয়েছে, শহরগুলো দামী হোটেল ও মলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যাপক বেসরকারীকরণের ফলে আন্তঃর্জাতিক মানের পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে প্রভৃতি সুফলগুলো প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই বৈষম্য বেড়ে গেছে, উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণের নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে, মানুষ ঋণে আটকে পড়ছেন। কালো টাকা, ঘুষ, চুরি, মেয়েদের উপর অত্যাচারের ঘটনা, কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিয়ম ও অবিচার দ্রুত বেড়েছে।

● তথ্য ও প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিকস্ ক্ষেত্র ছাড়া বোধহয় যে কোন বড় বিনিয়োগে প্রচুর জমির প্রয়োজন হয় ফলে ভারতবর্ষের সবচেয়ে ঘনবসতি রাজ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে খালি জমি মেলা সমস্যার ব্যাপার। এর উপর রাজনৈতিক মেরুকরণ অতি প্রকট হওয়ায় বর্তমানে আমরা জটিলতার মাত্রাও বুঝতে পারছি। সরকারের উদ্দ্যোগ ছাড়া একসঙ্গে এতটা জমি জোগাড় করাও সম্ভব নয় যেমন, তেমন সরকার উদ্দ্যোগী হলেই সরকার বিরোধী মনোভাব তৈরী করা সহজেই সম্ভব। ফলে খুব সীমিত সংখ্যক বড় বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হবে এই পরিস্থিতিতে। পক্ষান্তরে সীমিত জমি ছোট ও মাঝারি উদ্দ্যোগীদের মধ্যে বন্টন করলে বিনিয়োগের সংখ্যা বাড়বে, এই উদ্দ্যোগগুলি যখন আধুনিকরণের প্রয়োজন হবে বা নতুন অগ্রণী প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভর উদ্দ্যোগ হবে তখন বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে।

● শেষ অর্থাৎ ৩২তম জাতীয় নমূনা সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ২৭ লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প রয়েছে এবং এতে ৫৫ লক্ষ্য মানুষ কর্মরত রয়েছেন। সংখ্যা আরও বেশী বর্তমানে। রাজ্যে ৫০ শতাংশ শিল্পদ্রব্য এই ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত হচ্ছে। নতুন বিনিয়োগের সংখ্যার হিসেবে ৯৫ শতাংশ হয়েছে এই ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকারের হিসেব মত গত বছর বিনিয়োগের মোট পরিমান ৯০০০ কোটি টাকা যা অগ্রণী রাজ্য থেকে খুব একটা কম নয়। GDP বৃদ্ধির হার ৭.৯ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের প্রায় সমতুল্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তুলনায় অনেক কম বন্ধ হচ্ছে। এই রাজ্যে অর্থলগ্নী সংস্থাগুলিতে ঋণ পরিশোধের হার এই ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশের উপরে।

**পরিশেষ ঃ**

বাস্তবটা বিচার করে নিজেদের অবস্থান ঠিক করুন। মেধা ও কুশলতার সম্বনয়ে স্বউদ্দ্যোগগুলি বৃহৎ পুঁজি নির্ভরতা অনেকটাই কাটাতে পারবে এবং বিকল্পের সন্ধান দেবে।

Temper কারখানার পক্ষ থেকে বিপ্লব ভড়

## ● বৃত্তিমূলক শিক্ষা—কিছু উপলব্ধি কিছু প্রশ্ন—*প্রণব রায়*

বিশ্বায়নকে আমরা যে দৃষ্টিতেই দেখি না কেন ভারতবর্ষে বিশ্বায়ন আজ একটা বাস্তবতা। তাই এই বিশ্বায়নের যুগে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি ও কর্মকুশলতা এ রকম হওয়া প্রয়োজন, যার দ্বারা বিশ্বায়নের বাজারেও আমরা শুধু যে টিকে থাকতে পারি তাই নয়, বিশ্বায়নের সুফলও লাভ করতে পারি। আজও ভারতবর্ষকে কৃষি প্রধান দেশই বলতে হবে। কিন্তু আজ দেশের কোনে কোনে যেভাবে বিশাল কর্ম-কান্ড চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে আর বেশী দিন একটি বিশেষ বৃত্তিনির্ভর দেশ বলা যাবে না। এমন একটি সময় ছিল যখন আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ কৃষিকেই তাদের জীবিকা বলে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গত ৩০-৪০ বছরের সাংখ্যতত্ত্ব যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখতে পাব আমাদের রোজগেরে জনশক্তি কৃষিভিত্তিক পেশা থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। (সারনী-১ দ্রষ্টব্য)

সারনী-১

রোজগেরে জনশক্তির পরিসংখ্যান (শতকরা হিসাব)

| | 1981 | 1993-94 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| ক. কৃষি নির্ভর পেশা | 75.9 | 63.8 | 59.5 |
| খ. খনিজ-পদার্থ উত্তোলন | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| গ. কল-কারখানায় উৎপাদন | 9.5 | 11.6 | 12.2 |
| ঘ. বিদ্যুত, গ্যাস, জল সরবরাহ | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| ঙ. বাড়িঘর নির্মাণ ও স্থাপত্য | 1.5 | 3.2 | 4.4 |
| চ. ব্যবসা বাণিজ্য, হোটেল (Retail & Hospitality) | 4.3 | 7.6 | 9.4 |
| ছ. যানবাহন চলাচল | 1.7 | 2.9 | 3.7 |
| জ. অর্থ, বীমা | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| ঝ. সমাজসেবা, বিনোদন (Social service & Entertainment) | 6.1 | 8.8 | 8.4 |
| মোট — | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

প্রথম দুইটি ক্ষেত্র বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের চাবিকাটিটি থাকবে আমরা কত তাড়াতাড়ি আমাদের যুবশক্তিকে বিশেষ পেশাতে পারদর্শী করতে পারব তার উপর। এখানেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের দেশের পরিকল্পনাকাররা তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকাশের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছেন। 'সাঁকোর' একটি পূর্ববর্তী সংখ্যায় ভারতবর্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয় স্তরে, সরকারী ও বেসরকারী ITI গুলো এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম বৃত্তিমূলক শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। সারনী-২ থেকে ITI গুলির মাধ্যমে প্রত্যেক বছর কত জন শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ITI গুলোর মাধ্যমে শিক্ষা দানের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

সারনী-২

বিভিন্ন প্রদেশে ITI এর সংখ্যা ও শিক্ষার্থী-র পরিসংখ্যান (২০০৫)

| প্রদেশ | ITI&ITC এর সংখ্যা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রতি দশ লক্ষ জনগণের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 568 | 111585 | 1474 |
| তামিলনাড়ু | 676 | 87003 | 1401 |
| কেরালা | 549 | 60121 | 1888 |
| কর্ণাটক | 741 | 59916 | 1136 |
| মহারাষ্ট্র | 614 | 97184 | 1004 |
| গুজরাট | 264 | 87126 | 1722 |
| মধ্যপ্রদেশ | 313 | 51928 | 313 |
| পাঞ্জাব | 169 | 22398 | 371 |
| হরিয়ানা | 181 | 19067 | |
| পশ্চিমবঙ্গ | 67 | 12920 | 161 |
| সারা ভারতবর্ষ | 5253 | 738098 | 719 |

অন্যান্য প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় শাষিত প্রদেশের উল্লেখ করলাম না। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাই দুইটি জিনিষ। প্রথমতঃ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের রাজ্যে ITI/ ITC-র মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অপ্রতুল। দ্বিতীয়তঃ সব মিলিয়ে আমদের দেশে বৃত্তি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির অভাব যতটা মনে হয় ততটা নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হোল যখনই কোন বিশেষ শিল্পে তৃণমূল স্তরে কর্মপটু এবং উপযুক্ত বৃত্তি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়, তখন দেখা যায় প্রার্থীর অভাব। TMC Group নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন এবং কাজের পরিবেশ সেই হিসেবে ততখানি পরিষ্কার নয় অর্থাৎ কিছুটা ধূলো-বালিময়, উপযুক্ত ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর সন্ধান মেলা ভার। এটাও দেখা যায় হাতে সার্টিফিকেট আছে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপটুত্বর ছাপ পরিষ্কার। অর্থাৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতর সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কায়িক শ্রমে আগ্রহ নেই,—'গায়ে গতরে' কাজের নাম শুনলেই পিছিয়ে যায়। কোন একটি বৃত্তিতে শিক্ষিত হওয়ার পরও, সেই বৃত্তিকে পেশা হিসেবে না নিয়ে, প্রথাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে ভীড় বাড়িয়ে বেকারের দল ভারী করছে। এই সব দেখে শুনে মনে হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিধি আরো বাড়ানোর সত্যি কোন প্রয়োজন আছে কি!

**আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা**

TMC Group প্রায় দুই দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তাই TMC Institute of Learning (TMCIL) নামে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। বর্তমানে TMCIL যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহচার্যে একটি শিক্ষাক্রম চালু করেছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বনামধন্য খড়গপুর আই.আই.টি, কল্যাণী সরকারী কারিগরী মহাবিদ্যালয় ইত্যাদির সহযোগিতায় অনেক ক্ষুদ্র সময়ের শিক্ষাক্রমও চালাতে পেরেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জগতে আমদের স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ইতিমধ্যেই টক, ঝাল, মিষ্টিতে পরিপূর্ণ। আমরা দেখেছি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ITI পাশ করা চাকুরীপ্রার্থী যখন প্রকৃত কাজের সুযোগ পায় তখন দুই একদিন পরেই কাউকে না জানিয়ে অন্তর্হিত হয় এবং যে কটা দিন তাকে পাওয়া গেল, দেখা গেল হাতে কাজ করার অনীহা। এখন এটা তো সম্ভব নয় যে উৎপাদনকারী ছোট সংস্থায় মেশিন চালানোর জন্য একজন এবং অন্য দিকে উৎপাদনের মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য অন্য একজন নিয়োজিত করা হবে। সবাইকে সব কাজ করতে হয়, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে।

আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, থেকে দুটো বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম চালানোর অনুমতি পেয়েছি, যথাক্রমে ধাতুর অবিনাশকারী পরীক্ষন (NDT) এবং ধাতুর তাপ প্রক্রিয়াকরণ (Heat Treatment)। এই দুটি বিষয়ই ধাতু বিদদের কাছে চিত্তাকর্ষক বিষয়, অনেক কিছু শেখার আছে, মস্তিস্ক চালনার সুযোগ আছে। কিন্তু দুটো বিষয়েই কাজ কিছুটা শ্রমসাধ্য।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখলাম এই দুই বিষয়ে ছাত্র যোগাড় করা দুরুহ ব্যাপার। অথচ দেখা যায় পাড়ার মোড়ে যদি একটা Computer School বা Call Centre Traning Centre শুরু হয়, সেখানে ছাত্রের অভাব হয় না। আমরা জানি Computer School গুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গতানুগতিক শিক্ষার মাধ্যমে কিছু মাছি মারা কেরানী তৈরী করতে ব্যস্ত। আগে যেমন Typing School গুলো ছিল, তাদের পরিবর্ত্তিত রূপ হলো বেশীর ভাগ Computer Training School। তবে হ্যাঁ। আজকের দিনে অফিসের কেরানীদেরও পদের নাম পাল্টেছে, সুন্দর টেবিল-চেয়ারে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মনের ক্ষিদে কি তাতে মেটে? আর Call Centre গুলোর কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। চেতন ভগতের "One night at the call centre" যারা পড়েছেন তারা জানেন নিজেদের স্বাভাবিকত্ব এমনকি মা-বাবার দেওয়া নামটাকে বিসর্জন দিয়ে কেমন হাস্যকর ভাবে কাটাতে হয় কাজের সময়টা call centre-এর কর্মীদের।

তবু আমাদের এবং আমাদের শুভানুধায়ীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা, সর্ব্বোপরি আমাদের উপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বাস এর ভিত এর ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষাক্রমটা চালু করা গেল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে সম্মানজনক সংখ্যায় (হারাধনের দশটি ছেলে) ছাত্রও পাওয়া গেল। এই ছাত্রদের নিয়ে শুরু হল আমাদের একটি নিশ্চিত শিক্ষাক্রম চালানোর পথচলা। দেখতে দেখতে তিনমাস অতিক্রম করার পর ইউনিট-১ এহ শিক্ষাক্রম শেষ হল। শুরু হল ইউনিট-২ এর শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীদের দুইটি প্রধান বিষয় যথাক্রমে ধাতুর অবিনাশকারী পরীক্ষণ (NDT) ও ধাতুর তাপ প্রক্রিয়া করণের (Heat Treatment) মধ্যে একটি কে বাছতে বলা হল।

অপেক্ষাকৃত ভাবে ধাতুর তাপপ্রক্রিয়াকরণে পরিবেশ ধূলো বালির এবং শেড় এর মধ্যে তাপমাত্রা বেশী। এই কথা জানার পর কিনা জানি না, দেখা গেল শতকরা ৮০ জন শিক্ষার্থী NDT শেখার জন্য নিজেদের ইচ্ছে জানিয়েছে।

আর একটি সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বর্তমান শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগই অন্য কোন কারখানায় বা পেশায় কর্মরত। একটা বিষয় দেখা গেল, ভর্ত্তির সময় শিক্ষার্থীদের বাধা না দিলেও পরে পঠন পাঠনের সময় উপযুক্ত অবসর তাদের দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এরা Course টা করার পর যে কারখানায় কাজ আরো ভাল ভাবে করতে পারবে, এবং কারখানার কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে অগ্রণী হতে পারবে তা সবাই জানে। তবু এই অনীহা।

এই সব দেখে শুনে আমার কেন যেন মনে হয় আমরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা বলি, কিন্তু আমাদের মনের গভীরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেরকম ভাবে স্থান করতে পারে নি। তাই আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেই সব ছাত্ররাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে যাদের পরীক্ষায় ফলাফল সাধারণতঃ ভাল না। অর্থাৎ মানসিকতটা হলো যার কিছুই হবার নয় সেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু আমরা জানি উন্নত দেশগুলিতে যার মধ্যে উন্নতশীল চীন দেশও পড়ে চিত্রটা অন্য রকম।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরলাম। পাঠকদের কাছে আমার আবেদন তারা এই সব সমস্যার কথা ভাবুন ও আসুন সবাই মিলে নিজেদের পরিমণ্ডলে সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করি। চরৈবেতি।

## • "Soft-Skill Training কী এবং তার প্রয়োজনীয়তা"—*সুরজিৎ কুমার দত্ত*

আমার বিশেষ পরিচিত একটি ছেলে IIT—New Delhi থেকে Engineering-এ M. Tech করে IIM—Ahmedabad থেকে MBA পাশ করে। সে কোনো চাকুরী পায় নি, Professional কারণে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল—তার Soft Skill এর ভীষণ অভাব। এখন প্রশ্ন হল— এই 'Soft-Skill' ব্যাপারটা কি?

আসলে আজকের এই প্রচণ্ড গতিময় Corporate Culture-এর যুগে শুধুমাত্র 'Qualification' আর Experience'ই ভালো চাকুরী পাবার/কেরিয়ার গড়ার কিংবা চাকুরীতে উন্নতি করার Criteria হতে পারে না। তার জন্য চাই তার যথাযথ 'Soft Skill'।

এই 'Soft Skill যে কোনো ব্যক্তির Professional জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই Soft Skill বলতে এক ব্যক্তির Communication, Listening, Negotiation, Etiquette এবং ভাষার দক্ষতাকেই বোঝায়।

Soft Skills হল ব্যক্তিগত গুণ (Personal attributes) যেটা কোনো ব্যক্তির 'Interaction', 'Job

Performance এবং Career Prospect বৃদ্ধি করে। 'Hard Skill' এর মতো এটা কোনো নির্দিষ্ট রকমের কাজকর্ম বা কর্তব্য বোঝায় না। 'Soft Skill' নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত গুণাগুণকে বোঝায়।

যেমন •) Common Sense •) Responsibility •) Optimism •) Motivation •) Dedication towards perfection •) Integrity •) Time management. আবার 'Soft Skill' বলতে নিম্নবর্ণিত পারস্পরিক দক্ষতা বা ক্ষমতাকেও বোঝায়। •) Leadership •) Communication •) Good Manners •) Empathy.

তাহলে এখন প্রশ্ন কোনটা বেশী জরুরী Hard Skill না Soft Skill?

'Qualification' কিংবা 'Experience' এর মতো Hard Skill একজনকে Interview পেতে সাহায্য করলেও, Interview তে ভালো করা কিংবা চাকুরীটা পাবার জন্য Soft Skill এর উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত যে কোনো Professional এর জন্য 60টি Soft Skill প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক Soft Skill থাকা সত্ত্বেও Career-এ উন্নতি করার জন্য যত বেশী সম্ভব Soft Skill আয়ত্ব করা প্রয়োজন।

এই 60 Soft Skill হল নিম্নরূপ—

1) Mathematics 2) Courtesy 3) Safety 4) Grammer 5) Reliability 6) Flexibility 7) Eye Contact 8) Adaptability 9) Good attitude 10) Team Effect 11) Cooperation 12) Rule following 13) Self directability 14) Writing Skills 15) Good Reference 16) Advanced Thinking 17) Driving 18) Dependability 19) Critically Thinking Skill 20) Personal Integrity 21) Sensible 22) Willingness to learn 23) Motivational Skill 24) Attitude towards drug 25) Personal Chemistry 26) Personal Energy 27) Self-supervising 28) Self Critic 29) Ability to measure 30) Personal Integrity 31) Good work experience /history 32) Lave towards Education 33) Interpersonal Skill 34) Positive Work Ethic 35) Punctuality 36) Reporting 37) Ability to follow Instruction 38) Accountability 39) Data sheet fill-up ability 40) Reading and comprehension 41) Basic spelling and grammer 42) Willing to Improve 43) Appearance 44) Use of Rulers and Calculators 45) Knowledge of Fraction 46) Reading Tenacity 47) Nagging for Completion 48) Meeting the Target 49) Basic Manufacturing Skills 50) Business knowledge 51) Commitment to Continuous upgradation 52) Behaviour towards others 53) Documentation 54) Expectability 55) Working beyond the scheduled duty 56) Relation with co-worker 57) Tenacity to work for long hours 58) Love towards company 59) Knowledge about outer world 60) Memory.

প্রত্যেকটি Business কিংবা Profession-এ Communication Skill একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমরা অধিকাংশই এটা কি কিংবা এর প্রয়োগ কোথায় এ বিষয় কিছুই জানি না।

Communication Skill এর জন্য সব থেকে বেশী জরুরী আমাদের সামনের ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বা তারা কেমন, আমরা কী বিষয়ে কথা বলব, কতটা বলব, সে বিষয় জানা। কিন্তু ভালো Communicator-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গুণ/Quality হল 'Honesty of Speaking' বক্তা যখন কোনো কথা বলেছেন। তিনি সেই কথাটা কতটা বিশ্বাস করেন বা কতটা মানেন তার উপর সামনের ব্যক্তিকে Convince করাটা নির্ভর করে। অনেক সময় স্বভাবজনিত কিংবা অসুবিধাজনিত তোতলামি কিংবা Tension বা Tiredness উদ্ভুদ কথার অসংলগ্নতা বা অসমঞ্জসতা Communication-এর বিশ্বাসযোগতায় ব্যাঘাত ঘটায়। এর জন্য কথা বলার সময় Punctuation এর উত্তম ব্যবহার কিংবা Modulation এক জনকে সাধারণ বক্তা থেকে অসামান্য বক্তায় পরিণত করে। Communication Skill এর উন্নতির জন্য Non-Verbal Gesture যেমন Eye-contact, মুখের ভাব-ভঙ্গী এমনকি দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গীও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের Professional জীবনে অন্যান্য Soft Skill গুলোর মধ্যে Presentation Skill ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকে সুন্দর কথা বলেন, কিন্তু যখন তাকে বলা হয় একটা Group এর সামনে কোনো একটি বিষয়ে Presentation দিতে হবে, তিনি Nervous হয়ে পড়েন। আর তিনি যখন তার Presentation শেষ করেন তিনি ভাবেন বাঁচা গেল। আর তার শ্রোতারা একটা Terrifying এমনকি Phobic অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ী গেলেন।

Presentation Skill বৃদ্ধি করার জন্য নিচের Point গুলো মনে রাখা দরকার ঃ

* How nervous energy can be harnessed
* How to use the existing strength

* How to use effective body language
* How to follow Do's and Not Do's
* Two way communication
* Involving the audience
* How to be entertained and stimulated
* How to Create Effective Support Material

'Leadership Skill'—আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ Soft Skill। আমরা যদি 'LEADER' এই শব্দটি দেখি এতে ছটা alphabet আছে। যার প্রতিটি এক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ Leadership Quality.

(1) 'L'—Listening—একটি Team এর Leader এর শোনার মানে Critically শোনার দক্ষতা থাকা উচিত।

(2) 'E'—Expressing—নিজেকে ঠিকমতো Express অর্থাৎ তুলে ধরা কিংবা বোঝানো একজনের Leader হওয়ার পিছনে অনেকটা কাজ করে।

(3) 'A'—Assessing—বিষয়, বাস্তবতা ঠিকমতো মূল্যায়ন করা একজন Leaderএর আর একটি বিশেষ গুণ।

(4) 'D'—Discussing—একটা Team-এর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যেকোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ে discuss করার দক্ষতা।

(5) 'E'—Empowering—প্রয়োজনে নিজের মতকে জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করা।

(6) 'R'—Respond—সাড়া দেওয়া তার Sub-ordinate, Junior কিংবা followerদের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-প্রথাগত ট্রেনিং কি একজনের 'Soft Skill' বাড়াতে পারে?

এ বিষয় দুপক্ষেরই সমান সমান যুক্তি বা তর্ক আছে। কিন্তু যখন এই একজন তার Professional ক্ষেত্রে ভালো কিছু করতে চায়, তার কাছে 'Soft-Skill Training' ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

এই Training প্রয়োজন কারণ আমাদের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ধরণের Training এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা জানি একজন মানুষ তার জীবনকালের প্রতিটি পদে, প্রতিটি সমস্যায় না জানতেই অনেক Soft Skill শেখেন। তবে কী আমরা সমস্যা না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, না নিজেকে জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ রাখবো। যাতে করে Professional জীবনে চলার পথে যখন যেমন প্রয়োজন তখন প্রাপ্ত শিক্ষা Soft Skill Training কাজে লাগাবো। একজন বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয় বর্ষাকালে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ছাতা নিয়ে বার হবেন, নাকি হবেন না, তার জন্য অপেক্ষা করেন না।

## • Economic Significance of the Indian Diaspora*—*Prasun Ray*

The Indian Diaspora is a 20 million strong community and is spread across all the continents of the world. The Indian Diaspora has a huge purchasing power, estimated at around $300 billion and can, therefore, play an influential role in enhancing investment, accelerating industrial development and boosting India's international trade and tourism efforts. With the constant improvements in global communications and technology, India can hope to engage its diaspora to play an increasingly significant role in accelerating global economic growth for mutual benefit.

The celebration of the First Pravasi Bharatiya Divas in 2003 in this respect was a historic occasion which marked the beginning of a new chapter between India and the Indians abroad. This was an effort by the Indian government to win the help of overseas Indians to build economic future of India. Although the global Indians are being noticed and recognized in every corner of the world for their success, there exists a gap between the Global Indian Society and India. Only recently, strong efforts are being made to build bridges between the Indian diaspora and their native land.

It has been widely reported that the Non Resident Indians could help India to catapult

* Diaspora—Migration of a group of people having same national and ethnic identity, away from an established homeland.

it into a higher growth thus overtaking China in future. These reports are neither misguided nor confusing; it is based on the factual economic figures and emotional determination of the Indian Diaspora to take India to a new height. With appropriate conditions, the Indian Diaspora can provide India the necessary capital flows for sustained and rapid economic development to override many developed countries.

Since the economic reforms began in 1991, there has been structural change in India which is allowing it to grow at a healthy pace. When India faced its worst balance of payments crisis in the early nineties, its foreign exchange reserves were dwindling and it was coming perilously close to defaulting on meeting its international payments obligation, India turned to its “National Reserve Indians” and it was NRI deposits that helped India to come out of this crisis. In India’s 55 years of history this was the first imprint of the important role the Indian Diaspora could play in building Indian economy.

The Diasporic community may influence India’s economic development mainly in three broad ways. These are :-

- ***Establishment of a Knowledge Economy***
- ***Foreign Direct Investment (FDI)***
- ***Remittances***

**Establishment of a Knowledge Economy**

Let us first focus on the achievements of the Indian migrants in the field of information technology. There are over 300,000 People of Indian Origin (PIOs) working in the Information Technology sector in the US (2004 figures). Although this number represents only three percent of the total IT workforce in the US, a substantial number of them are executives in mid and large-sized companies and at least 15 percent IT start-ups have been created by them. As in 2004, there were between 650 to 700 companies in Silicon Valley that were either partly or totally owned by Indian migrants or had at least one Indian migrant in its executive management team. Out of the 18,250 emigrant IT professionals who entered the UK in 2000, 11,474 were from India. If we focus only on the US IT industry, Asian Indians in the US may be the most successful immigrant community in the US history. Of the 1.7 million-strong Indian Diaspora in the US, 200,000 people were millionaires and the median annual income of Persons of Indian Origin in the US (PIO-US) was USD 60,093, which was substantially higher than the US median income of USD 38,885.

Thus, it can be inferred that potentially, the Indian diaspora could play a major role in the development of the knowledge industry in India. This in itself would be a major catalyst in the economic growth of India, since it is common knowledge that knowledge services have been the major driver behind the unprecedented economic growth in India seen in the last decade.

The initial seeds were sown in early 1970s. The initial driver for development of the industry was a need for foreign exchange. Coupled with that, the regressive trade regulations restricted entry of advanced hardware technology. So Indian entrepreneurs had to take the ingenuous route of developing hardware and software indigenously. Their success led to India becoming a major player in this field by the 1980s. India was the only developing nation to have any significant software exports – USD 12 million at the beginning of early part of nineties of the last century – a substantial leap over the 1979 level of USD 4.4 million and 30 companies were already beginning to export software. Main competitive advantage for Indian companies was obviously the cost and the ability to communicate using the English language.

During this period, the role of Indian Diaspora in the evolution of Indian IT industry was limited to that of a patient mentor and brand ambassador in most of the cases. They coached and guided the Indian companies to enable them in improving their quality and performance standards.

However, as we moved into the 90s, the emergence of offshore outsourcing due to the advent of the Y2K problem provided a major opportunity for Indian players to leverage on their strengths and emerge as an IT superpower. Currently, India has moved way beyond being a destination for low cost IT services obtained through offshoring. It is now the destination of choice for obtaining cutting edge software technology and business solutions. Thus its competitive advantage has shfted from cost to that of thought and technology leadership. The Indian diaspora has played a significant role during this period. The foremost contribution has been investment. Entrepreneurs, venture capitalists and senior Indian executives in global majors have propelled investment in the Indian IT industry. Non-profit associations such as SIPA (Silicon Indian Professional Association) have developed into a worldwide network of Indian professionals which has had a substantial influence on the Indian IT industry and government policies towards it.

However, The Indian Diaspora can potentially play a more significant role moving forward. Apart from providing some of the required capital (through investments), the Indian Diaspora is increasingly expected to play the following crucial roles in the gradual emergence of India's High-end knowledge services sector:

- Facilitating the gradual evolution of IT and ITES sector towards higher value-add, knowledge intensive outsourcing through mentoring and coaching the incumbent offshore vendors. This will involve imparting know-how of building knowledge intensive service firms and relevant transfer of best practices.
- Pitching for the Indian industry without giving a semblance of bias for their home country over other low-wage destinations. Also, their own brand equity as capable and successful professionals will lend increasing credibility to the might and ability of Indian firms, thus increasing the equity of 'Brand India'.
- Leveraging the Indian network to create win-win situations with other Diaspora and other IT communities, e.g., the Chinese Diaspora and the Chinese software and hardware manufacturing communities (in China, Taiwan, and Hong Kong).

**Foreign Direct Investment (FDI)**

In India, the share of Diasporic FDI in total FDI between 1991-2003 stands at around 4.18%. The Indian Diaspora has not come forward as investors in the Indian economy in the scale that was expected post-liberalization in the early 1990's. Diasporic FDI, especially in comparison with China, has been very modest. As India underwent economic liberalization, making the economy more outward oriented, diasporic FDI into India increased rapidly. However, FDI never played as substantial a role in India's capital formation process as it did in China. The table shown does an comparison of FDI flow in India as against China.

There are quite a few reasons because of which Diasporic FDI has not contributed as much as it should have.

The professional expertise of a Diaspora is very important factor in explaining the kind of economic linkages that it would share with the country of origin. A significant reason that explains India's failure to tap Diasporic investments may be attributed to the fact that most Indian expatriates are either professionals or traders (i.e. retailers, wholesellers or other type of service providers) and lack the learning process in managing export oriented labor intensive manufacturing.

Another constraint faced by Indian investors is the policy of reservation of several products for small and medium enterprise. This effectively means that larger entrepreneurs cannot produce these products. Worse still, such reserved production lines cannot be expanded and/or upgraded by existing small-scale entrepreneurs through additional investment in plant and machinery. Given the definition of what is small-scale, only those plants and production units that fit that definition are allowed to produce these.

**Table 1 : Indian and Chinese FDI**

| Year | INDIA | | CHINA | |
|---|---|---|---|---|
| | FDI million USD | FDI as % Gross Capital Formation | FDI million USD | FDI as % Gross Capital Formation |
| 1982 | 72 | 0.2 | 430 | 0.6 |
| 1983 | 6 | 0.0 | 636 | 0.8 |
| 1984 | 19 | 0.0 | 1258 | 1.4 |
| 1985 | 106 | 0.2 | 1659 | 1.4 |
| 1986 | 118 | 0.2 | 1875 | 1.7 |
| 1987 | 212 | 0.2 | 2314 | 2.4 |
| 1988 | 91 | 0.4 | 3194 | 2.8 |
| 1989 | 252 | 0.2 | 3593 | 2.8 |
| 1990 | 162 | 0.1 | 3488 | 2.8 |
| 1991 | 74 | 0.5 | 4366 | 3.3 |
| 1992 | 277 | 1.0 | 11156 | 7.4 |
| 1993 | 550 | 1.3 | 27575 | 14.7 |
| 1994 | 973 | 2.3 | 33787 | 15.1 |
| 1995 | 2144 | 2.8 | 35849 | 12.5 |
| 1996 | 2426 | 2.0 | 40180 | 12.4 |
| 1997 | 3857 | 2.0 | 44237 | 12.9 |
| 1998 | 2635 | 2.6 | 43753 | 12.3 |
| 1999 | 2169 | 2.0 | 38753 | 10.9 |
| 2000 | 2315 | 2.1 | 38399 | 9.9 |
| 2001 | 3400 | 2.5 | 44240 | 10.4 |
| 2002 | 3900 | 2.9 | 46880 | 9.9 |
| 2003 | 2470 | 3.2 | 52740 | 10.1 |

Source: Global Develolpment Finance Indicators, World Bank

Thus, it can be inferred that the Government is well placed to encourage investments from the diaspora through the instruments of policy. Current thought leadership suggests the following policy endeavours :

- **Allow 100 % FDI in retail and Small and Medium Enterprises (SME) :** Currently FDI in retail is allowed only in single brand entities. FDI in SME's is limited to only 24%, with any foreign investment above 24% being subject to industrial license with a mandatory export obligation of 50% of annual production and the manufacturer losing small scale status. Both restrictions are major impediments to FDI, and specifically Diasporic FDI. A large number of Indian entrepreneurs in the US, UK and other parts of the developed world are very successful retailers. Their expertise and capital are being prevented from being put to productive use in the Indian economy. A viable retail chain network often creates backward linkages with extremely positive effects on growth of efficient supply chain networks. Such networks in turn reduce cost to market and induce scale economies in several products that then become more competitive in the global market

- **Develop a Strategic Vision for FDI with focus on exports, technology, geographic specialization, and employment creation :** The problem is that India's FDI policy does not have a focus. the Indian FDI regime suffers because it is passive (open to all, without any targeting) and not strategic as in China. India's FDI policy

should have prioritized investment in labor intensive manufacturing, for acquisition of technology and for the establishment of international trading channels to facilitate labour-intensive exports.

- **Reduction in Transaction Costs, Improvement of Infrastructure and Enabling Trade Facilitation:** Transaction costs of operating a business in India remain prohibitive and infrastructure and logistical support poor. Transaction costs arising out of poor infrastructure, logistics and administration affect SME's and other smaller players the most. As was pointed out, the average diaspora investor is most likely to be small scale and such investors will feel the persistence of high transaction costs most acutely. In order to attract FDI, India first must become a competitive production base where people would want to invest.

- **Similar Treatment to International and Domestic Entrepreneurship:** India should have a holistic investment policy that creates an enabling mechanism for both India's domestic as well as international investors and entrepreneurs, not single out preferential treatment for any one set of investors. To give preferential treatment to FDI over domestic capital and the associated entrepreneurial resources that go with it is to restrict this factor of production from contributing efficiently in the economy.

- **Decentralization of Administration Process:** The Indian FDI policy process still remains highly centralized in Delhi and that is a major impediment in effective competition between states and efficacy in administration of FDI initiatives in many parts of India. This needs to be rectified

- **Drastically Reduce Overly Bureaucratic FDI facilities:** India's bureaucratic set-up maintains several investment and trade promotion bodies that work at cross purposes. There is also a lack of policy consistency. There needs to be a real single conduit that draws from the sectoral expertise of the different ministries, and more importantly the private sector. The Ministry of Overseas Indian Affairs can play this role for investment from the Indian diaspora and collaborate with the Department of Industrial Policy and Promotion, and the Foreign Investment Promotion Board, that implement foreign investment policy.

**Remittances**

India, the world's largest remittance recipient country, accounts for 73% of the flow to South Asia. The United States and the Middle East are the two most important sources of remittances to India. The lowered cost and increased competition of remittance agents has increased the proportion of formal remittances. Since 2001, the fees charged have decreased because of greater competition. The use of the Internet has also made it easier to send remittances. In many cases the post office has given way to banks and now to online transfers for sending money home. Workers' remittances are almost three per cent of India's GDP and have provided considerable support to India's balance of payments. They have offset India's merchandise trade deficit to a large extent, thereby keeping current account deficits modest through the 1990s and posting modest surpluses in 2001-02 and 2002-03. Moreover, workers remittances have exhibited the lowest volatility among all categories of current receipts, after merchandise exports.

The role of remittances can be enhanced using two levers : Maximizing remittances and maximizing the impact of remittances.

The best tool to maximize remittances is to have appropriate exchange rates and economic policies, but ease of access and cheaper money transfers can increase the volume of remittances and the share that flows through formal channels— governments can more easily monitor official flows and can sometimes borrow against expected remittances at lower-than-normal cost.

Most remittances are spent by recipients on items needed for daily living. Since remittances often exceed what the

breadwinner would have earned at home, some portion is usually spent on other items, including housing, education, health care etc. There is a multiplier effect of remittance spending, so that each $1 in remittance spending can generate $2 to $3 in local economic activity, meaning that non-migrants can benefit indirectly from migration, especially if remittances are spent on locally produced goods.

**Conclusion**

India is fast emerging as a global economic superpower. Indian Diaspora will have to play a more involved role if India is to achieve this vision. A key enabler of this will be government policies. The Government needs to focus on profitability of the diasporic commitments in India, rather than appealing to patriotic sensibilities of diasporic Indians. The Indian Diaspora also needs to have a more strategic and visionary mindset. The Indian Diaspora located in various countries need to work together in a collaborative manner and come up with a long-term coherent roadmap to aid India in achieving the economic stature it is aspiring for.

## শিশু ও কিশোর বিভাগ

সমৃদ্ধা চ্যাটার্জী

## বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০০৯

# A Challenging Role

**Souravi Chatterjee**

Oh God! This year SAANKO's annual program of 31st October provided me with a great challenge to deal with. On this auspicious day, the reputed organization celebrated Kabiguru's 150th birth anniversary. The organization members were pre-determined to play his famous dance-drama 'Shyama' with me as the Character of Bajrosen.

From the very day of getting this news I was dumbstruck in tension. But there soon arose in me an underlying happiness and determination to perform the character and to do full justice with it. Our director, Choreographer and the Team Captain was Rishi Gupta who is an accomplished dancer and he was to perform the role of Uttio. The other team members were Sampriti as 'Shyama', Sreyoshidi as 'Kotal', and Aninditadi, Ria, Priyanka, and Madhuchanda as the four 'Sokhis' of Shyama. Finally, all of us enchanting the Almighty began our reharsal. My Shyama is a student of class V while me is a 3rd year college student. The chemistry and the synchronisation between us really stood as a hectic job before us. The jodi of us was somewhat like that of Amitabh and Jaya in respect to height.

We got the maximum rebuke from Rishi particularly during the song ''Premero Joware' because of the lack of coordination between us. The other members like the Kotal and the 'Sokhi's also underwent through a lot of ups and downs. The disunity and the imperfection of the four 'Sokhis' who were genuinely non-dancers actually stood as our major hindrance, in the drama. But all of them through their dedication, time, enthusiasm and hard work overcame the problem.

In this whole stage the main moral supporters of us were our parents and guardians without whom it would never have been possible to enact the drama so successfully with such a grandeur and extravagance I couldn't remember one day when the 'Kakus' didn't give us evening snacks after the rehearsal.

On the final rehearsal we were destined to engage ourselves on a full day practice. After the first half our lunch was served which actually came from SAANKO. The lunch was served by Ma and 'Kakimas' with lavish arrangements and we just grasped the Rumali Roties and Chicken Kasa. We enjoyed the delicious food by our watering mouth. After having the lunch we had our second half of the Rehearsal. The rehearsal on that particular day also endorsed some hilarious moments which we could never forget. While performing with the 'Khunti' which became a substitute for the kotal's sword, it slipped from her hand and fell into the lap of a 'Sokhi', who was mesmerisingly watching the act.

The toughest part for me was to enact the climax scene where I was supposed to give the expression of an assimilated hatred and furiousness towards my beloved. I was to retain that expression especially, in that part where Bajrosen came to know about Shyama's immoral deed of provoking the innocent 'Uttio' to surrender to the 'Kotal' by taking up the blame of stealing wealth from 'Rajkosh' in order to save the 'Banik Bajrosen'.

The favourite part of my role was the last portion where Bajorsen surrenders himself to God by declaring him as the ultimate guilty who couldn't forgive Shyama and demolished the prevailing love among them.

After a long drawn rehearsal the program approached and the final count down was started. The show was a success and all of us got a lumpsum amount of applause. The song 'Premero Joware' was greeted with a good appreciation, which made me feel that my learning of dance was a well taken decision of mine.

I felt quite honoured and proud to attach myself with such a noble organisation SAANKO and I wish to visualize myself as performing any sort of nominal role in it if I ever get any such opportunity in future. I will cherish this incident for a long time.

# আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

## (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষে তাঁরই রচিত কবিতা ও গান নিয়ে শ্রুতি আলেক্ষ্য)

## চরিত্র ঃ অমল ও মিনি

অমল ঃ বলতো দিদি আমি কে?
মিনি ঃ কে আবার? তুই অমল। আমার ভাই।
অমল ঃ উহু! হলো না, হ....লো না। আমি হলাম বীরপুরুষ।
মিনি ঃ তা কেমন বীরপুরুষ একটু শুনি
অমল ঃ (আবৃত্তি)

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চড়ে
দরজাদুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।

মিনি ঃ তারপর..... সূয্যি পাটে নামে, সন্ধে হল, জোড়াদিঘির মাঠ, চোর কাঁটা, দিঘির ধার, মা যেন তোকে ডেকে বললে.... (আবৃত্তি) দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!
অমল ঃ (আবৃত্তি)

এমন সময় হাঁরে রে-রে রে-রে
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
আমি আছি, ভয় কেন মা করো।

মিনি ঃ (আবৃত্তি)

হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল
কানে তাদের গোঁজা জবাব ফুল।
তুই বললি......

অমল ঃ (আবৃত্তি)

দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর.....
এর চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল হাঁরে রে-রে রে-রে।।

মিনি ঃ (আবৃত্তি)

তুমি বললে যাস নে খোকা ওরে।

অমল ঃ (আবৃত্তি)

আমি বলি, দেখো-না চুপ করে।
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে....
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেলো ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।।

মিনি ঃ (আবৃত্তি)

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।

অমল ঃ (আবৃত্তি)

আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে।

মিনি ঃ আমার ও না সেই বিচিত্র সাধের ফেরিওয়ালার মতো এ-গলি থেকে ও-গলি, ও-গলি থেকে সে গলি ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে।
অমল ঃ কি করম একটু শুনি.....
মিনি ঃ (আবৃত্তি)

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের ওই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ শুনতে পাই
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
চুড়ি চা....ই, চুড়ি চাই সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।।

অমল ঃ ঠিক বলেছিস্ দিদি। ফেরিওয়ালাদের কি মজা নারে। ওদের পড়াশুনা করতে হয় না। কারোর বকুনি খেতে হয় না.....

মিনি ঃ শুধু ওদের কেন? বাগানের মালি, কিংবা পাহারওলা, ওদের কোন কাজে কেউ বাধা দেয় না।
অমল ঃ আমার শুধু খেলতে ইচ্ছা করে।
মিনি ঃ আমারও। ভাই চল খেলতে যাবি?
অমল ঃ কোথায়?
কোরাস ঃ (আবৃত্তি)

জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল -
ছেলেরা করে মেলা।
বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-' পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।।

অমল ঃ ওই দেখ্ মা আসছে, এক্ষুণি বলবে পড়তে বসো।
মিনি ঃ ঠিক বলেছিস। এক্ষুণি পড়তে বসতে বলবে।
অমল ঃ দিদি, তুই মাকে বলনা আমার এখন পড়তে ভালো লাগছে না।
মিনি ঃ ঠিক আছে, আমিই বলছি - (আবৃত্তি)

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হল তাই।
একদিনও কি দুপুর বেলা হলে
বিকেল হলো মনে করতে নাই?

অমল ঃ জানিস্ দিদি আমার না একটুও পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।
মিনি ঃ কেন?
অমল ঃ কি হবে ওরকম বাবার মতো পড়াশুনা করে বই লিখে? আমি তো ওর মানে কিছুই বুঝি না।
মিনি ঃ (আবৃত্তি)

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে
বুঝেছিলি? বল মা, সত্যি করে।
এমন লেখায় তবে
বল দেখি কি হবে।

অমল ঃ কিন্তু দিদি একটু পড়েই আবার গুরুমশাই আসবেন।
মিনি ঃ (আবৃত্তি)

তিনি যদি বলেন সেলেট কোথা -
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো।

অমল ঃ (আবৃত্তি)

আমি বলব, খোকা তো আর নেই
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।

মিনি ঃ (আবৃত্তি)

গুরুমশাই শুনে তখন কবে
বাবুমশাই, আসি এখন তবে।

অমল ঃ দিদি আমার শুধু মনে হয় কোথাও দূরে, অ-নেক দূরে চলে যাই।
মিনি ঃ কোথায় যাবি?
অমল ঃ (আবৃত্তি)

মধু মাঝির ওই যে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে -
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা -
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
আমি কেবল যাই একটিবার
সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার।

মিনি ঃ আমিও তোর সাথে যাবে বনবাসে। সেখানে বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় দুজনে মিলে ঘর বেঁধে থাকতাম আর বলতাম..... (আবৃত্তি)

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে?
চোদ্দ বছর কদিনে হয়
জানি নে মা ঠিক -

দন্ডক-বন কোথায় আছে
ওই মাঠের কোন দিক
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি না তাতে -
লক্ষণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

অমল ঃ আমি বাবা তোর সঙ্গে যাব না!
মিনি ঃ কেন? কেন?
অমল ঃ তখন আবার তুই বিজ্ঞের মতো মাকে বলবি.....
মিনি ঃ (আবৃত্তি)

সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি 'খুকি পড়া করো
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে
তোমার খুকির পড়া কেমন তরো।

অমল ঃ তার চেয়ে চল দু'জনে মিলে একটা গান গাই
মিনি ঃ ঠিক্ সেই, সেই বা.....উলের মতো

(আবৃত্তি) ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে গড়া
তেমার তালা-ভাঙার পাঠ
আমার আর কিছু না চাই
যেন আকাশ খানা পাই
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।

গান ঃ (অমল, মিনি ও কোরাস্)

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি উর্দ্ধে ভাসে।।
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিবদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা....
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।।

**সংকলনে - সঞ্জয় দাশগুপ্ত**

# জলছবি

**অয়ন ঘোষ**

মাথার ওপর ঠা ঠা রোদ্দুর। তবু পায়ে পায়ে মেঠো পথটা ধরে এগিয়ে যেতে কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গরম হাওয়ার সঙ্গে এক ঝলক ঠান্ডা জোলো হাওয়া মিশে গিয়ে তপ্ত শরীরটা জুড়িয়ে দিচ্ছিল। চারপাশের ধূ ধূ উঁচু নীচু পাথর বের করা রুক্ষ জমি থেকে গরম ভাপ উঠছে। মাঝে মধ্যে কিছুতেই না মরা কয়েকটা ঝোঁপঝাড় ছাড়া সবুজের চিহ্ন নেই। সেই সবুজ রঙটাও কেমন মাটিটার মতোই গেরুয়া ঘেঁসা। পেছনে ফেলে আসা গ্রামটা খুব দূরে নয়। কিন্তু তার চেহারাটা এখনই কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছে। উষ্ণ হাওয়ার দাপটে সে ছবিটাও কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। একেই বুঝি দিগন্তে লি লি করা বলে! কোথায় যেন পড়েছিলেন কথাটা? নাকি কারও মুখে শুনেছিলেন? ঠিক মনে পড়ছে না। ভাবতে ভাবতে, আনমনে একটা শুকনো ডাল হাতে নিয়ে, ধুলোয় দাগ ফেলতে ফেলতে চলতে লাগলেন তর্পণ।

তর্পণ রায়চৌধুরী, ছবি সম্পর্কে যারা একটুও খোঁজ খবর রাখে, তারা তর্পণ রায়চৌধুরীকে একডাকে চেনে। এখন আর খুব বেশি ছবি আঁকেন না। বছরে দু'বছরে একটা প্রদর্শনী হয়। কখনও একা, কখনও নবীন শিল্পীদের সঙ্গে। দাম যথেষ্ট চড়া রাখা সত্ত্বেও ছবি পড়ে থাকে না। জীবনে নাম, যশ, পুরস্কার কম পাননি। আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে ভাবতে অবাক লাগে। শুরুর দিকে জীবনটা কিন্তু এমন ছিল না।

ছোট থেকেই আঁকতে ভালবাসতেন। কখনও পথের ধুলোয় আঁকতেন, কখনও বা খাতার পাতায়। তার জন্য কখনও মার খেতেন, কখনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা পেতেন।

সেই ভালবাসাটা চূড়ান্ত রূপ নিল, যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন। পড়াশোনায় খারাপ ছিলেন না। নইলে প্রেসিডেন্সির মত কলেজে ঠাঁই জুটবে কেন? কিন্তু ছবির টানে পড়াশোনা ছেড়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন।

স্বপ্ন ভাঙতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। স্বাধীনচেতা তর্পণ রায়চৌধুরীর তুলি আর্ট কলেজের নিয়মবাঁধা পথে চলতে পারল না। চরম বিরক্তি নিয়ে আর্ট কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন। নিজের শিক্ষার ভার এবার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

ছবির প্রদর্শনীগুলোতে অনেকটা সময় কাটাতেন। বাকিটা কাটাতেন বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। কখনও শহরের রাস্তায় টো টো করে ঘুরতেন। নয়তো ট্রেনে চেপে চলে যেতেন শহর থেকে দূরে। সঙ্গী হতো রঙ-তুলি-কাগজ। প্রথম থেকেই জলরঙটা বড় প্রিয় ছিল।

তারপর ষ্টুডিওর চার দেওয়ালের মধ্যে বসে, মনের দরজাগুলো হাট করে খুলে দিতেন। বাস্তবের দৃশ্যপট শিল্পীর মনের পর্দায় ছবির রূপ নিত।

মাঝ পথে পড়াশোনা বন্ধ করা বা আর্ট কলেজ ছাড়া নিয়ে যেমন বাড়ি থেকে কোনো বাধা বা বিরোধিতার সম্মুখীন হননি, তেমনি শিল্পী হিসেবে লড়াই করার দিনগুলোতেও সেখান থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য মেলেনি।

আঁকা রপ্ত করার অনুশীলনের পাশাপাশি তাই ছবি বিক্রীর লড়াইটাও তাঁকে একাই চালাতে হচ্ছিল। চোখে স্বপ্ন নিয়ে বড় হতে চাওয়া আর পাঁচটা শিল্পীর মতই ছিল গল্পটা। তাদের কেউ সফল হয়, কেউবা প্রতিভা নিয়েও হারিয়ে যায়। কিন্তু ভেতরকার একটা অদ্ভুত জেদ তাঁকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। প্রতিভার স্বীকৃতি মিলেছিল।

একটু একটু করে চিত্রকর হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়েছে। যাঁরা ছবি ভালবাসেন তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আজকের তর্পণ রায়চৌধুরী কিন্তু সেদিনকার মতোই নিরলস। নামী-অনামী শিল্পীদের প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ান। মন চাইলেই লোটাকম্বল নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। আজ আর পাথেয় নিয়ে ভাবতে হয় না। প্রাণ চাইলে যেতে পারেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে।

পথের ধূলোয় দাগ কাটতে কাটতে পথ চলা; ছোটবেলায় তর্পণের একটা প্রিয় খেলা ছিল। আপনা থেকেই বড় সুন্দর আঁকিবুকি নকশা তৈরি করত। আজ সেই খেলাটা খেলতে বড় ভাল লাগছে।

একটা ছোট্ট ঢিপি পার হতেই সামনের সব কিছু বদলে গেল। জমিটা ঢালু হয়ে মিশে গেছে সামনের চরে। বিশাল বালির চরের মাঝখানে একফালি কাচের মত স্বচ্ছ নদীটা হারিয়ে গেছে। পায়ে পায়ে সবুজ কাশবনের ফাঁকফোকড় দিয়ে বয়ে চলা জলের সোঁতাগুলো টপকে টপকে মাঝের নদীটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তর্পণ।

তিপু...... তিপু-উ..... কচি গলার ডাকটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। তিপু নামের ছেলেটা তখন বটের শেকড়ে হেলান দিয়ে বিভোর হয়ে বসে আছে। তার চোখের মণিতে অস্তসূর্যের রঙ। ছোট্ট নদীটা বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেছে টিলার নীচের জঙ্গলের ফাঁকে। বাঁশবনের মাথা টপকে, গয়লা পাড়ার খেঁজুর গাছটা বেয়ে সূর্য্যিটা পাটে নামছে।

''কিরে তিপু! ঘর যাবি না?'' শরীরে হাতের ছোঁয়া পেয়ে একটা ঘোরের মধ্যে থেকে তিপু বলে ওঠে, ''দ্যাখ শমি, কী সুন্দর ছবি!'' তারপর সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মাঠের দিকে ছোটে। আঁধার নামার আগে গরু গোয়ালে না তুললে আস্ত চ্যালাকাঠ পিঠে ভাঙবে যে।

তিপু...., তিপু-উ....। কে ডাকছে তিপুকে? তিপু বলে ছেলেটা তখন চানের ঘাটে দাঁড়িয়ে শাপলা পাতায়, জল ফড়িঙের ডানায় সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি রঙ দেখতে মগ্ন। বন্ধুদের ডাকে হুঁশ ফিরতেই জলে ঝপাং তারপর তাদের দাপানিতে পুকুরের জল কালো আর সবার চোখ রাঙা।

তিপু...., তিপু-উ....। তিপু তখন বিশাল কালো আঁধির মতো ধেয়ে আসা মুষলধারে বৃষ্টির সামনে স্থির। নীল বিদ্যুতের ছোবলে শিউরে ওঠা মাঠ-বন তখন তিপুকে গুণ করেছে। মায়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরতে সে মাঠ-বন ভেঙে বৃষ্টির আগে ছোটে।

তিপু....., তিপু-উ.....। গরমের দুপুরে, নিমের ঝির্‌ঝিরে ছায়ায়, ঘাসের বিছানায় শোয়া তিপুর মনটা তখন ক্ষেতের পারে, দূরের গ্রামটার কাঁপা কাঁপা ছবির সঙ্গে দুলছে। দিদির হাতে নুন-লঙ্কা জরানো কাঁচা আমের ফালিটা নড়ে উঠতেই নিমেষে চুলোচুলি বেঁধে যায়।

নদীর বালিতে বসে একটা স্বপ্ন দেখছিলেন চিত্রকর। আজকের এই রুখা শুখা জায়গাটাতেই কি ছিল তিপুদের সেই গ্রামটা! সেই ছোট্ট তিপু; ইস্কুলের খাতায় যার কিনা পোষাকী নাম লেখানো ছিল তর্পণ রায়চৌধুরী; বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবু সত্যি! আজ প্রায় চল্লিশ বছর পর গ্রামে ফিরছেন তর্পণ। দূরের ঐ ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা পাঁচ-সাত ঘর মানুষ, ফসল ঝলসে যাওয়া মাঠ আর নদীর বাঁকে, পাথর ভাঙা হলে আধখানা লোপাট হয়ে যাওয়া ন্যাড়া টিলাটাই কি তাঁদের গ্রাম! তিপুর চোখে দেখা যে ছবিটা আজও বিখ্যাত চিত্রকর তর্পণ রায়চৌধুরীর মনে গেঁথে আছে, সে ছবি কোথায়? কোথায় সেই শ্যামলা-সবুজ গাঁ টা! কোথায় টিলার নীচের সেই জঙ্গল!

ছন্নছাড়া মাঠ-প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, মনের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা ছবিটা আঁকার একটা অদম্য ইচ্ছে অনুভব করলেন তর্পণ। সেই ছোট্ট তিপুর দেখা গাঁয়ের ছবি; সেটাই আঁকবেন তিনি। কিন্তু কোনো কাগজে বা ক্যানভাসে নয়। আঁকবেন ঐ রুখা শুখা জমিটার ওপর, ঐ ন্যাড়া পাহাড়টার নীচে। আশা হারানো, কোনো রকমে টিঁকে থাকা মানুষজনই হবে তাঁর রঙ-তুলি।

সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত জেদ তাঁর মধ্যে জেগে উঠছে। সেই জেদটা। যেটা তাঁকে পড়াশোনা, আর্টকলেজ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। যেটা তাঁকে আজকের তর্পণ রায়চৌধুরী তৈরী করেছে।

পোষাক থেকে বালি ঝেড়ে দ্রুত পায়ে গ্রামের দিকে ফিরতে লাগলেন তর্পণ। তাঁর সামনে এখন অনেক কাজ। ছবিটা যে আঁকতেই হবে।

# বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০

অনুপম ঘোষ

১১ই জুন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের উপকণ্ঠে সকার সিটি স্টেডিয়ামে শুরু হল ১৯তম বিশ্বকাপের আসর। ফিফার প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্ল্যাটার এবং দক্ষিণ অফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। প্রতিযোগিতার সূচনা করে জুমা বলেন, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল দক্ষিণ আফ্রিকা। সত্যিই তাই, কারণ এই প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসল কোন আফ্রিকান দেশে। বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনার জন্য এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল এককথায় দারুণ হল।

বিভিন্ন মহাদেশের মোট ৩২টি দেশ এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা তো ছিলই, সঙ্গে ছিল ইউরোপের অন্যতম প্রবল প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, আফ্রিকার কোস্টারিকা। নতুন ছিল ঘানা, আয়োজক দেশ দঃ আফ্রিকা। এশিয়া মহাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করে উঃ কোরিয়া, দঃ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ৮টি গ্রুপ করা হয়। প্রতি গ্রুপে ছিল মোট চারটি করে দল, দারুন উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে ১১ই জুনের উদ্বোধনের দিনে খেলায় অংশগ্রহণ করে আয়োজক দেশ দঃ আফ্রিকা ও মেক্সিকো। খেলার ফলাফল ১-১। এবারের বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেন দঃ আফ্রিকার শাবালালা, মেক্সিকোর পক্ষে রাফায়েল মার্কেজ অপর গোলটি করেন। ব্রাজিল, আজেন্টিনা, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের বাধা টপকালেও আগের বারের জয়ী ইটালী, ১৯৯৮ সালের জয়ী ফ্রান্স প্রথম রাউন্ডেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায়। এই দুটিই বোধ হয় সব থেকে বড় অঘটন, এশিয়ার দেশগুলিই প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ ভালো ফুটবল উপহার দেয় ফুটবল প্রেমীদের।

**প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ঃ** প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২টি দেশ একে অপরের সঙ্গে মোট ৪৮টি ম্যাচ খেলে। সেখান থেকে মোট ১৬টি দল প্রি-কোয়াটার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেখানে যেমন ব্রাজিল, স্পেন, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ছিল, তেমনি ইটালী, ক্যামেরুন, ফ্রান্স সম্ভবনা থাকলেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পায়নি। সমগ্র বিশ্বের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী এখান থেকেই প্রকৃত প্রতিযোগিতা শুরু। সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাবাসীরাও দারুণ আগ্রহের সঙ্গে টিভির পর্দায় চোখ রাখি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উল্লেখযোগ্য জয় পায় আর্জেন্টিনা, জার্মানীর মতো দলগুলি।

**কোয়ার্টার ফাইনাল ঃ** মোট ৮টি দল এই পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রথম খেলায় ঘটে যায় বড় অঘটন। এই খেলায় নেদারল্যান্ড দলের কাছে পরাজয় ঘটে বিশ্বফুটবলের প্রবল শক্তিশালী ব্রাজিলের। নেদারল্যান্ড ব্রাজিলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। আর এক সম্ভাব্য বিজয়ী জার্মানীর কাছে ০-৪ গোলে পরাজিত হয় দিয়োগো মারাদোনার আর্জেন্টিনা। এই ফলাফলে আমরা কলকাতাবাসীরা মর্মাহত হয়ে পাড়ি। একমাত্র আফ্রিকার দেশ হিসেবে ঘানা কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হলেও ইতিহাস সৃষ্টি করে। ইউরোপের আরেকটি দল স্পেন, প্যারাগুয়েকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করে।

**সেমিফাইনাল ঃ** মোট চারটি দল, উরুগুয়ে, নেদারল্যান্ড, জার্মানী এবং স্পেন সেমিফাইনাল পর্যায়ে পৌছায়। ১৯৩১, ১৯৩৪ সালের পর এটাই উরুগুয়ে দলের সব থেকে ভালো পারফরম্যান্স।

যাইহোক, দুটি সেমিফাইনাল খেলার প্রথমটিতে নেদারল্যান্ড ৩-২ ব্যবধানে উরুগুয়েকে হারিয়ে তৃতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে যায়। অপর খেলায় স্পেন শক্তিশালী জার্মানীকে ১-০ গোলে পরাজিত করে প্রথমবারের জন্য ফাইনালে পৌঁছায়। সেমিফাইনালে দুই পরাজিত দল অর্থাৎ উরুগুয়ে এবং জার্মানীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধীকারীর জন্য যে খেলা হয় সেই খেলায় জার্মানী উরুগুয়েকে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করে।

**ফাইনাল ঃ** ১১ই জুলাই ২০১০ জোহানেসবার্গের সকারসিটি স্টেডিয়ামে প্রায় ৯১০০০ দশকের সামনে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলাটি। দুটি দলই তাদের প্রথম বিশ্বকাপ জেতার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু, শেষ বাঁশি বাজার ৪ মিনিট আগে স্পেনের আন্দ্রে ইলিয়েস্তা স্পেনের হয়ে জয় সূচক গোলটি করে। শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল হয় স্পেন ১ ও নেদারল্যান্ড ০। প্রথমবারের জন্য ফাইনালে উঠেই স্পেন অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞকে অবাক করে বিশ্বজয়ী দলের তকমা অর্জন করে। আবার পরবর্তী বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা বসবে ব্রাজিলে ২০১৪ সালে। ততদিন শুধুই অপেক্ষা।

**উপসংহার ঃ** দীর্ঘ একমাস দারুণ ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে পেলাম। দারুণ গোল দেখা গেল। বেশ কিছু ভালো ফুটবলারকেও দেখল সারা বিশ্ব। উল্লেখযোগ্য নতুন কিছু শব্দ যেমন ''ভুভুজেলা'' (এক ধরনের বাঁশি), 'পল' (একটি অক্টোপাস যে নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পারে), 'বাফানা-বাফানা' (দক্ষিণ আফ্রিকার উপনাম), 'জাবুলানী' (যে বলে খেলা হয়েছিল) প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানে জায়গা করে নেয়।

আমাদের দেশ ভারত এখন ও পর্যন্ত না পারলেও আমরা আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন প্রান্তের ফুটবল মাঠে বিশ্বকাপের আসরে বেজে উঠবে আমাদের একান্ত

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা

---

# Durga Puja-the festival of the elites and antisocials

**Sunny Roy Choudhury**

যাদেবী সর্বভুতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা......

This sweet tune in the voice of our beloved and respected Birendra Krishna Bhadra marks the beginning of a new era of festival in the monotonous life of the Bengalees—the Durga Puja, the festival of the festivals. It was meant for the get-together of the neighbours, friends and relatives.

Earlier Durga Puja had a different flavour. It was not celebrated with so much grandeur. Idols of goddess Durga were made out of clay and worshipped in every temple of every locality. Neighbours of all classes assembled there to make the festival a grand success. Rather we can say there was no distinction between the rich and the poor.

Nowadays, in the last few years, the grandeur of celebration of Durga Puja has enhanced very much. It has not remained only as a festival, it has become a competition of idols, pandals, decorations, arrangements and many more. The traditions of the previous days have disappeared.

Swamiji wanted that there should be no class distinction after the independence of India. But after 63 years of independence the naked picture of our country is revealed in front of the whole world.

Most of the people in our country are fanatics. So the cheats of the society collect money in the name of religion and people of the society are so literally immoral that they are providing them with unnecessary huge amounts of money. This huge wastage of money creates a wall between the rich and the poor.

Our society has reached the lowest stage of culture. The antisocial loafer boys in their teens disturb the society by cracking fire crackers and noisy bombs. But they do not think about the society where there may be a patient suffering from heart disease; where there may be a student studying for board exams like Madhyamik, Higher Secondary. They only think of their own dirty amusement.

There are some aristocrats in the society who put on costly dresses. But when a deprived beggar wants some financial help from him, he shouts abuses upon that beggar and neglects him. This is not the picture of the society of which Swamiji had dreamt.

We claim ourselves to be a developing country and the 3rd power of the world. But until class distinction and antisocial activities are removed from our path of progress, our country will not become what we want it to be. In spite of these drawbacks we say shamelessly—

'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

---

# A 21st Century Love Story, Perhaps?

**Surya Sekhar Chakraborty**

To be frank and honest, forget meeting, I have not even seen her. I have no clue whatsoever as to what she looks like. Is she bright? Is she not? Is she skinny? Is she full? Is she tall? I have no answers. I do feel that she is beautiful because all virtuous women I have seen are all beautiful in their ways. But again, I do not know how she looks. I am not even sure of her age. She could be old enough to be my grandmother, couldn't she? But I have a strong hunch that she is of my age.

I have only talked with her. Chatted, rather. The mutual desire to ping the other first, the playful discussions of the humdrum affairs of our respective lives, the interstitial humor, the enlightening words macerating the desire to leave the computer and Facebook once and for all, and the numerous smiley's have each their sublime glory. Confined only to a colorful procession of nameless monochrome faces in numerous turgid friends' lists, where each face is just another odd brick in tremendously large walls which jot out unevenly and yet is bragged about! "Look here mate. Here I gotta six hundred friends"… and five and a half hundred of which I do not know. What am I saying? Of my sixty "friends", only about thirty are personally known to me. And "she" is not among them.

Look at me! Incorrigible as I am, sitting down to write a love story and off I go into my philosophizing. Is this perhaps what they call the Facebook effect?

Well, I do not know. Maybe one day, I will be at City Centre, awaiting my turn at the Food Court when you will walk past me, and in the process bump into me, spill a little Coke on my expensive shirt which I had worn for the first time, mumble an inaudible apology, flash a blank smile and just walk off without waiting to delve the profundity of my eyes. Maybe I will forget all about it until we chat later that day, and you say, "Do u noe? 2day @ CC a fool spild my drnk." Could it possibly have been somebody else?...

I wonder…

# (স্ব) তান্ত্রিক

**সূর্য্যশেখর চক্রবর্ত্তী**

**মধ্যাহ্নে।**

প্রখর রৌদ্র। রঙ্গিনীর রাস্তা মাটির পথে এক জটাধারী তান্ত্রিক আপনমনে চলিতেছেন। তাহার বাম হস্তে এক কমণ্ডলু বারি। গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি বটবৃক্ষ তলে আসন বিছাইয়া বসিলেন। প্রস্তরমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিয় স্বললাটে সিন্দুর লাগাইলেন। গ্রামীণ কিছু প্রবীণ ভদ্রলোক আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। এক মধ্যবয়স্কা মহিলা তাঁহার পদতলে লুটাইলে তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে প্রসন্নবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উহারা যখন স্থানত্যাগ করিলেন তখন জটাধারীর খাদ্যপাত্র নানাপ্রকার ফলমূলে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি গম্ভীরস্তরে এক হুঙ্কার ছাড়িয়া ভক্ষণ আরম্ভ করিলেন।

**বৈকাল।**

গুটিকতক শিশু আসিয়া পূর্ব পরিচিত আগন্তুকের সহিত খেলিতে লাগল। ক্রীড়া সমাপ্তিতে সাধু সকলকে একটি করিয়া প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করিলেন। উৎফুল্ল হইয়া তাহারা লাফাইতে লাফাইতে নিজ গৃহে ফিরিল।

**প্রদোষ**

সূর্য্য নিকটবর্ত্তী অরণ্যের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়াছেন। সাধু বেশ বড় একটি আগুন জ্বালাইলেন। তবে আগুনটি যজ্ঞের কারণে নহে, মশক বধের জন্যে। জনাকয়েক বৃদ্ধা আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া অন্নদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

**গভীর রাত্রি**

ঘনান্ধকার জটাধারী তখন গ্রামের অপর সীমানায়। তিনি ঘৃণাভরে গ্রামের পানে চাইলেন। ‘‘শালাগুলোর এত ভিক্তি তবুও একটা টাকাও দিল না। ছাই, এখন খৈনী কিনি কোথা থেকে?’’

# শারদীয়া

## শ্রুতিলক্ষ্মী কাবাসী

আসছে পূজো, আসছে পূজো
কী আনন্দ ভাই
আসছে দুগ্গা বাপের বাড়ি
আনন্দের সীমা নাই,
আসছে লক্ষ্মী, সরস্বতী
সঙ্গে গণেশ, কার্ত্তিক
বাহনেরাও আসবে যেন
সবার সাথে ঠিক, ঠিক,
আনন্দেতে নাচবো সবাই
ঢাকের তালে তালে
দেখব ঠাকুর অনেক অনেক
রাত, দিন, সকালে,
দশমীতে মাগো তুমি
ফিরে যাবে বাড়ি,
তখন মোদের সবার মনে
দুঃখ হবে ভারী,
করজোড়ে বলব তখন মা-গো
সবাইকে ভালো রেখো,
একটি বছর বাদে কিন্তু
আবার তুমি এসো।

---

# নেট ওয়ার্ক

## রঙ্গীত মিত্র

বসার জায়গাগুলো তুলে নিয়ে গেছে
আমি একটি মেয়েকে বড় সাইজের একটা খাতা রোল করতে দেখেছি।
সে ঐ খাতার ভিতর থেকে অন্য একটি মেয়ে যার মুখ থেকে উজ্জ্বল বাষ্প উড়ছে
একটা পেনের মাথায় যেমন আগুন দিলেই সিগারেট হয়ে ওঠে
কোলড্রিংকসটা আরো গভীর বোধহয়
আমাদের গ্যারেজের সামনেটা আটকে একটা রিক্সা
ওই গ্যালারির উপরের চাতালে চারজন মেয়ে আড্ডা দিচ্ছে।
আমি গিঁট পাকাতে পাকাতে নেট ওয়ার্ক বানাচ্ছি।

---

# স্কুল কন্যে

## মুদ্রা (শ্রীধন্যা)

আমি যদি হতাম
কোন এক রাজকন্যে,
কি হত বল দেখি?
সবাই ব্যস্ত হত আমার জন্যে।
কিন্তু আমি এখন শুধু
স্কুল কন্যে-স্কুল কন্যে
রেষারেষি হানাহানি
পড়াশুনার জন্যে।
কেন পড়ব? কেন পারব?
কেন হারব না?
কেন বল আমার মত
চলতে শিখব না?
আকাশে মেঘ করলে
যখন ময়ূরগুলো নাচে,
কি মজা আর কি আনন্দ
বৃষ্টিতে ওরা ভেজে।
পাখিগুলো এধার ওধার
করে ছোটাছুটি,
আমি তখন একা একা
বারান্দাতেই হাঁটি।
আবার যখন খুব গরমে
হাঁসেরা সাঁতার কাটে,
আমি তখন AC ঘরে
মায়ের সঙ্গে, খাটে।
সত্যি বল, এসব কি আর
আমার ভালো লাগে?
স্কুল কন্যে হলেই বা কি
আমারও তো সাধ জাগে।

---

# নূতন প্রাচীন ছিল

**সূর্য্যশেখর চক্রবর্ত্তী**

যখন প্রাতঃকালে সূর্য্য হেসে ওঠে,
যখন রাত্রি ফুঁড়ে আলো দাঁড়ায় উঠে,
যখন চন্দ্রমামা পালায় খালি পায়ে,
ও তারারা সকলে দ্যুলোক পানে যায়।
যখন পাখির কলরবে নিদ্রা ভাঙে,
ও সাইকেলের ঘন্টি টুং টুাং বাজে,
কাজের মাসিরা সব বাসনগুলো মাজে,
ও খুকুমনিটি মুখটি লুকায় লাজে,
তখন হৃদয়টিকে কর পরিস্কার,
অকারণ আলস্যকে কর বহিষ্কার,
ওই উপাধানটি রেখে দূরে সরিয়ে,
চাঁদবদনটি ধুয়ে, দাঁত মেজে ফেলে,
বসরে পুস্কর খাতার ডেরায় গুরু।
ভুলিসনে আজ নতুন দিনের শুরু।।

# Ocean

**Raddur**

Ocean is a space where,
something happens every time,
sometimes its a space of joy,
sometimes are for violence.
But its a real place of beauty,
sometimes its red with blood!!
sometimes its blue with peace....

When rain falls....
and then till madness
filled its brain—
The ocean kissed the rain,—
Dear mother, give me a time,
give me a new life!!
Let me experience and wonder;
through the new life in ocean.

# সন্তু

**রোদ্দুর**

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে
ওকে দেখি রোজ
শাড়ীর দোকানে লাল সবুজের
মধ্যেই ওর খোঁজ।

সবাই জানে কিন্তু বলতো
কে খুঁজবে ওকে যে
জগৎ জুড়ে কেউ যে নেই
শুধু দোকান মালিক সে।

দুটো খেতে পায়
কাজ করে তাই
সারাদিনটা কাটে
পড়াশুনা হল না, দুঃখে বুক ফাঁটে।

অমল বিমল নাড়ু নাকি
ও টনি বনি ছিল
আজ রয়েছে নতুন নাম
কিভাবে সন্তু বনে গেল।

একদিন এক ঝরনা তলায়
হঠাৎ ভরাডুবি
সবাই গেল সন্তু শুধু
সবার মাঝে রইল।

এমন কত সন্তু থাকে
কিচ্ছু জানে না
ঠাকুর তুমি ওদের কে
দাওনা সঠিক ঠিকানা।

# বোমারু

**রঙ্গীত মিত্র**

বোমারা লাফিয়ে পড়ছে জিপের উপর
পুলিশ লেখাটাও আমাদের জামার মত
আমরা কয়েক জনের দল নিয়ে অন্যগ্রহে
আমাকে রাতে ডেকে নিয়ে গেলো
কারণ আমি ওদের দলে নেই
আমি রাজনীতিটা বুঝি না
তোমাকে অপেক্ষা করতে বলে ও, সেই দশদিন আর এলো না।

# বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০০৯

## নাটক - হারানো প্রাপ্তি

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

# কথামালা ডট্ কম্

## মেষশাবক ও নেকড়েবাঘ

অমূল্যভূষণ পাল

জঙ্গলে ঘেরা উঁচু পাহাড়। তার গা জড়িয়ে নামছে ঝর্ণার স্রোত। সেই স্রোতে জল খেতে এলো এক বাঘ। হঠাৎ সে শুনতে পেলো চক্‌চক্ শব্দ। তাকিয়ে দেখে, আহা! কী নধর, কী সুন্দর, ধবধবে ফুটফুটে নাদুসনুদুস এক ভেড়ার বাচ্চা। যেন এক তাল রাবড়ি। পাহাড়ের ঢালুর দিকে অনেক নীচে একই ঝর্ণায় একমনে সেও জল খাচ্ছে। বাঘের জিভে জল এলো। অন্য জল। লোভের।

এক দৌড়ে নীচে নেমে এলো বাঘ। এসেই যা-তা গালাগালি শুরু করলো বাচ্চাটাকে। কিন্তু বাচ্চাটাও তো আজকালকার বাচ্চা। ভয়-ডর নেই প্রাণে। বললো—ছিঃ বাঘমশাই! তুমিই না আমাদের জাতীয় পশু? তোমার এমন বিদিকিচ্ছিরি ব্যবহার কেন?

বাঘ তো রেগে টং।

তুই আমার খাবার জল ঘুলিয়ে দিলি যে বড়ো! এই ঘোলা জল খেলে নির্ঘাৎ আমার পেট ছেড়ে দেবে। এখন তোর রক্ত ছাড়া আমার তো পিপাসা মিটবে না।

জ্যাঠা ভেড়ার বাচ্চা বললো—বাপ্ রে! তুমি তো দেখছি দারুণ দিগগজ। এতো গুণ না থাকলে কি আর জাতীয় পশু হওয়া যায়? জল তো চিরকাল ওপর থেকে নীচের দিকেই যায় বলে সবাই জানে। গায়ের জোরে আর নিজের গরজে তুমি দেখছি তাকে 'অ্যাবাউট্ টার্ন' করিয়ে দিলে। আসলে আমার ঘাড় মটকাতে তোমার একটা ছল ছুতো চাই-তাই আলতু ফালতু বকছো।

বাঘ ভয়ানক রেগে উঠলো—সেই সেবার যখন আমায় জাতীয় পশু করার কথা ওঠে, তখন তুইই তো সবচেয়ে বেশি বাগড়া দিয়েছিলি-আমার স্বভাবচরিত্র নাকি ভালো না এই বলে আমার বদলে সিংহকে জাতীয় পশু করার জন্য খুব ক্যাম্পেইন্ করেছিলি সে সব আমি ভুলে গেছি ভেবেছিস?

ভেড়ার বাচ্চা চোখ কপালে তুলে বললো সে কী! আপনাকে যখন জাতীয় পশু করা হয় তখন আমার জন্মও হয়নি যে—

তাহলে তোর বাবাই আমার হেনস্তা করে অন্যের নামে ভোট কুড়োচ্ছিলো। বলেছিলো আমি নাকি হিংস্র, অকারণ নরখাদক, রগচটা, আহাম্মক আরো কত কি!

আজ্ঞে আমার বাবাকে ধরে শুনেছি নাকি বিদেশে চিড়িয়াখানায় যখন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আমি তখন মায়ের পেটে। আপনার মিথ্যাচারের গল্প বিদ্যাসাগরের কথামালায় পড়েছি। ভেবেছিলাম, হাজার হোক, ওটা তো আদপে গল্প-ই। সত্যি সত্যি নিশ্চয়ই আপনি অতোটা আমার তো এখন ইচ্ছে করছে বিদ্যাসাগরমশাইকে গিয়ে অনুরোধ করতে যাতে 'হস্তিমূর্খ' কথাটা বদলে 'ব্যাঘ্রমুর্খ' চালু করা যায়।

বাঘ এবার লম্ফ দিয়ে গর্জন করে উঠলো—তবে রে! যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা? এবার তোকে কে বাঁচায় দেখি! তোর হাড় মাংস খেয়ে—

'দাঁড়াও'

এবার মেষশাবকের গলার স্বর জলদগম্ভীর—নাঃ, তুমি দেখছি সেই কথামালার যুগেই এখনো বাস করছো। শোনো, তোমার কাছে আমার প্রাণের কোনো দাম নেই জানি। কিন্তু তোমাকে প্রাণে মারতে আমার যে বিবেক দংশন হচ্ছে! কারণ, আমরা উভয়েই পশু, একই দেশ আমাদের, একই জাতি। শোনো, তোমার পিছনের বড়ো গাছটার ডালে দুই মানুষ শিকারি ওঁৎ পেতে বসে আছে। ওরাই আমাকে পাঠিয়েছে এই ঝর্ণার ধারে। তোমার বুদ্ধির দৌড় যে কথামালার যুগের থেকে একচুলও এগোয়নি এ তথ্য দেখছি ওরাও জানে। নইলে আমাকেই আবার টোপ হিসেবে এখানে পাঠায়? আমি দেখতে পাচ্ছি এখন ওরা বন্দুকে টিপ করছে। তুমি আবার বোকার মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যেওনা। গুলি ছুটে এলো বলে গুড়ুম গুড়ুম করে। তোমাকে শিকার করে তোমার হাড় ছাল চামড়া মোটা দামে বিক্রি করে ওরা ধনী হবে। তুমি যখন আমাকে খাবার কথা ভাবছো, তার অনেক আগেই তুমি নিজে ওদের খাদ্যতালিকায় উঠে গেছো। এ সত্যটুকু তুমি হয়তো বুঝছো না। তুমি......

কথা শেষ হবে কী? তার আগেই তিন লম্বা লাফে বাঘ পগার পার।

অনেক বকবক হয়েছে। জল তেষ্টা পেয়ে গেলো।

বড়ো করে একটা নিঃশ্বাস নিলো ছোট্টো মেষশাবক। তারপর পিছন ফিরে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝর্ণার জলের আয়নায় একবার নিজের মুখটা দেখলো আর জলে ঠোঁট ঠেকানোর ঠিক আগে একবার ফিক্ করে হেসে উঠলো।

# উত্তরসূরি

## পালি বসাক

অমিত মুখার্জী একটি নামকরা বেসরকারী সংস্থায় উচ্চপদে চাকুরীরত। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন তিনি। সঙ্গে দিদি-জামাইবাবু এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনও আছেন।

অমিতবাবুর মোবাইলে ঘনঘন ফোন আসছে। প্রত্যেকটি ফোন ধরে একটু কথা বলে রেখে দিচ্ছেন। এমন সময় তার বাবার ফোন আসে। জিজ্ঞেস করেন--খোকা বউমা কোথায় এবং কেমন আছে?

—কিছুক্ষণ আগে ও.টি.তে ঢুকিয়েছে। ভেতরে কী হচ্ছে আমরা এখনও জানতে পারিনি। সবাই আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। তাছাড়া নমিতা ছাড়াও আরো দু'জন মহিলার আজ সিজার হবে।

—কোন খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাবি। তোর মা আর আমি খুব টেনশনে আছি। ঠিক আছে বলে তিনি ফোন রেখে দেন।

অমিতবাবু এবং তার বাড়ির লোকদের টেনশন হওয়াই স্বাভাবিক। বিয়ের দশ বছর পর নমিতা প্রথম সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। কত ডাক্তার দেখিয়েছে। কোন কিছুতেই কিছু হয়নি। সকলেই একইকথা বলেছে—দুজনেরই কোন শারীরিক ত্রুটি নেই। এমনকি উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তুকতাক, তাবিজ-কবজ করতেও বাদ রাখেন নি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। অবশেষে ওরা সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। তারপর হঠাৎই নমিতা সন্তান-সম্ভবা হয়।

সেই নমিতারাই আজ সিজার হচ্ছে। অমিত বাবু বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। দিদির অনেকদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে। দিদির একটি মাত্র মেয়ে। অমিতবাবুর এতদিন সন্তান না হওয়ায় খুব চিন্তায় ছিলেন তার বাবা-মা। বংশ রক্ষা করার জন্য কেউ থাকবে না। তাছাড়া এতবড় বাড়ি, এত সম্পত্তি কে ভোগ করবে! আজ তাই সবাই খুব টেনশনে আছে।

ভালয়-ভালয় সব মিটলে হয়। অমিত এবং নমিতার কাছে ছেলে কিংবা মেয়ে একটা হলেই হল। শুধু তারা সুস্থ একটা বাচ্চা চায়। তাদের বাবা-মার ব্যাপারটা আলাদা। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারা পুত্রই কামনা করে।

ও.টির দরজা খুলে যায়। এজন অল্পবয়সী ডাক্তার বেরিয়ে এসে বলেন—নমিতা মুখার্জীর বাড়ির লোক কে আছেন?

অমিতবাবু এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর কাছে যান এবং বলেন,

—আমরা নমিতা মুখার্জীর বাড়ির লোক।

উৎসুক নয়নে সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে।

ডাক্তারবাবু বলেন,

—সিজার হয়ে গেছে। ছেলে হয়েছে। মা এবং বাচ্চা উভয়েই ভালো আছে। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে সবাই আস্বস্ত হয়। জিজ্ঞেস করে,

—বাচ্চা এবং মাকে কী আমরা এখন দেখতে পারবো?

—এখন নয়। ওয়ার্ডে দিলে দেখবেন।

অমিতবাবু বাড়িতে ফোন করেন। সুসংবাদ শুনে তার বাবা-মা খুব খুশি হন। বাচ্চা দেখে সবাই খুব খুশি। কী সুন্দর, ফুটফুটে, ফর্সা, নাদুস-নদুস বাচ্চা। নমিতার মনটা আনন্দে ভরে যায়। এতদিনে তার মনে হচ্ছে ভগবান নিশ্চয় আছে।

অমিতবাবুর বাবা-মা নাতি বলতে অজ্ঞান। ডাকনাম রাখেন বাবুসোনা। ভাল নাম দীপজ্যোতি।

বাবুসোনাও ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমার খুব ন্যাওটা। রাতে শুধু বাবা-মার কাছে শোয়। সারাদিন নমিতা ছেলের পাত্তা পায় না। এতে অবশ্য তার কোন ক্ষোভ নেই। তার ছেলের জন্য যে বাড়ির পরিবেশটা একদম পাল্টে গেছে এই ভেবে সে খুব আনন্দ পায়।

অমিতবাবু ছেলেকে সবচেয়ে নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করান। বাবুসোনা সবার আদরে বড় হতে থাকে। সে যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি পড়াশুনাতেও ভাল।

অমিতবাবুর বাবা-মা নাতিকে নিয়ে খুব গর্ব করেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সারাক্ষণ নাতির প্রশংসা করতে থাকেন। অমিতবাবুও মনে মনে অহংকার করেন এমন এক পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। বাবুসোনার সঙ্গে সঙ্গে নমিতার আদরও বেড়েছে। নমিতাও খুব খুশি।

বাবুসোনার তেরো বছর বয়স। ক্লাস এইটে পড়ে। স্কুল থেকে একদিন পেট ব্যাথা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা অস্থির হয়ে পড়েন। তারা তাড়াতাড়ি অমিতবাবুকে ফোন করেন এবং খুব শীঘ্রই চলে আসতে বলেন।

তিনি এসে ছেলেকে তাদের হাউস-ফিজিসিয়ানের কাছে নিয়ে যান।

ডাক্তারবাবু সব দেখে ব্যথা কমআনোর জন্য ওষুধ দেন এবং একজন সার্জেনকে দেখিয়ে নিতে বলেন।

সেদিনের মতো ওষুধে ব্যথা কমে যায় বটে। কিন্তু পরের দিন আবার ব্যথা শুরু হয়। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে সার্জেনের কাছে নিয়ে যান। সার্জেন খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে বাবুসোনাকে পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষা করার পর তিনি অমিতবাবুকে বলেন,

—একটা হোল অ্যাবডোমেনের আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে। ভাল জায়গা থেকে ইউ.এস.জিটা করাবেন তারপর রিপোর্ট নিয়ে আমার কাছে আসবেন।

অমিতবাবু সার্জেনকে বলেন,

—কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—রিপোর্ট না দেখে কিছু বলতে পারবো না।

—ব্যথা কমানোর জন্য কোন ওষুধ দেবেন কী?

—না, নতুন করে কিছু দেব না, আগে যা খাচ্ছিল, তাই খাবে।

বাড়ির লোকেরা সবাই খুব চিন্তিত। পরের দিনই ইউ.এস.জি রিপোর্ট নিয়ে অমিতবাবু ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারবাবু সমস্ত রিপোর্ট মন দিয়ে দেখে অমিতবাবুকে বলেন,

—আপনার ছেলের যা হয়েছে তাতে আমার কিছু করণীয় নেই। অমিতবাবু উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করেন,

—কী হয়েছে আমার বাবুসোনার?

—আমি একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে ও কে রেফার করছি। খুব তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে যান। অমিতবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন,

—আমার ছেলেকে গাইনোকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যাবো? এ আপনি কী বলছেন ডাক্তারবাবু? কী হয়েছে সেটাই বলুন না?

—আমি বললেও আপনারা বুঝবেন না। তাছাড়া এব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। যা বলার গাইনোকোলজিস্টের বলবেন। অগত্যা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির সবাই শুনে বলেন,

—ডাক্তারবাবুর কী মাথা খারাপ হয়েছে?

সেদিন ভোরবেলা থেকে বাবুসোনার প্রচন্ড পেট ব্যথা শুরু হয়।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই অমিতবাবু ও নমিতা ছেলেকে নিয়ে গাইনোকোলজিস্টের কাছে যান। গাইনোকোলজিস্ট ইউ.এস.জি রিপোর্ট দেখে অমিতবাবুকে বলেন,

—আপনার স্ত্রী এবং ছেলেকে একটু বাইরে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। ওঁরা বেরিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু বলেন,

—আচ্ছা অমিতবাবু, আপনি কী জানেন কেন পেট ব্যথা হচ্ছে?

—না, আমি কিছু জানি না।

—আপনার ছেলের ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে।

—ডাক্তারবাবু, আপনার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

—না, অমিতবাবু, আমি পুরোপুরি সুস্থই আছি। আসলে জানেন কি? আপনার ছেলে বাইরে ছেলে কিন্তু ও আসলে মেয়ে। ওর শরীরে নারী অঙ্গ বিদ্যমান। সেইজন্য ওর মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হয়েছে। সেই মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড বাইরে বেরতে পারছে না, তলপেটে জমা হচ্ছে। সেই জন্য ওর পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ওর ইমিডিয়েট অপারেশন করা দরকার।

—তার মানে আপনি বলতে চান আমার ছেলে হিজড়ে।

—আপনার ছেলে উভলিঙ্গ। তবে নারী অঙ্গগুলি বেশি প্রমিনেন্ট পুরুষ অঙ্গগুলির থেকে। আপনার ছেলের অপারেশন করে পুরুষ অঙ্গগুলি কেটে বাদ দিয়ে নারী অঙ্গ গুলি রাখলে নারী হিসেবে ও মনে হয় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।

—কিন্তু জন্মের সময় তো ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নি।

—বলবে কী করে। বাইরে থেকে তো কিছু বোঝা যায় না।

আপনার ছেলের তো একটা টেস্‌টিস নেই। আর একটা যা আছে তা খুবই ছোট, মনে হয় ভবিষ্যতে ইনঅ্যাকটিভ থাকবে। তাছাড়া পুরুষঅঙ্গটি বয়সের তুলনায় খুব ছোট।

অমিতবাবু দেরি না করে আপনার ছেলেকে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করুন।

অমিতবাবু থমথমে মুখে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। নমিতা জিজ্ঞেস করে,

—কী বললেন ডাক্তারবাবু?

তিনি ঝাঁপিয়ে ওঠেন এবং বলেন,

—বাড়ি গিয়ে শুনবে।

ওরা বাড়ি পৌঁছালে তার বাবা-মা দৌড়ে আসে, শুধান,

—খোকা ডাক্তারবাবু কি বললেন?

—এখন বলতে পারবো না। পরে বলব।

অমিতবাবুর গম্ভীর মুখে দেখে তার বাবা-মা আর কিছু বলেন না।

বাবুসোনাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে ব্যথার ওষুধ দিয়ে সন্ধ্যের কিছু পরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাতে অমিতবাবু; তার বাবা-মা এবং নমিতা একসঙ্গে খেতে বসেন।

অমিতবাবুর বাবা খুব আস্তে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন-দেখ খোকা, আমরা খুব চিন্তার মধ্যে আছি বাবুসোনার ব্যাপারে। বল্ না আমাদের দাদু ভাইয়ের কী হয়েছে?

অমিতবাবু অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন,

ওর যা হয়েছে তা তোমরা কোনদিন কল্পনাও করনি। আমার নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে।

—হেঁয়ালি রেখে কী হয়েছে সেটাই বল?

—বলতে আমার লজ্জা করছে। তবুও যখন শুনতে চাইছো, বলছি। তাছাড়া এ ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করতে হবে। জান কি তোমরা তোমাদের দাদুভাই আসলে হিজড়ে?

অমিতবাবুর বাবা আর্তনাদ করে ওঠেন, বলেন-বলিস্ কী রে খোক! ডাক্তারবাবু ঠিক বলেছেন তো?

—ঠিকই বলেছেন। ইউ.এস.জি রিপোর্টি তো মিথ্যে বলবে না। আসলে বাবুসোনার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। রক্ত ভেতরে জমা হচ্ছে। তার জন্যই পেট ব্যথা করছে। ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে। অপারেশন করে পুরুষঅঙ্গগুলি কেটে বাদ দিলে ও মেয়ে হয়ে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। এব্যাপারে তোমাদের মতামত চাই।

—আমাদের বংশে তো আগে কখনও কারও ক্ষেত্রে শুনিনি। মুখার্জী বংশে এরকম একটি সন্তান হতেই পারে না।

তিনি নমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন বউমা তোমাদের বংশে এরকম কেউ নিশ্চয় আছে, না হলে বাবুসোনা এরকম কী করে হলো? নমিতা আমতা-আমতা করে বলে,

—না, বাবা আমি তো কারো ক্ষেত্রে শুনিনি।

অমিতবাবু বললেন,

—কী লজ্জার ব্যাপার বলতো! পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে? ইস্ এর চেয়ে সন্তান না হলেই ভালো ছিল। অমিতবাবুর বাবা বললেন-সত্যিই তো আমরা সমাজে মুখ দেখাবো কী করে? আত্মীয় স্বজনরা যারা এতদিন আমাদের হিংসা করতো, এবার তারা মজা দেখবে। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

—কিন্তু অপারেশনের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে।

—এ ব্যাপারে তোর মতামতটা কী শুনি?

—আমি তো ভেবেছি নারী অঙ্গ গুলিই কেটে বাদ দিয়ে দিক ডাক্তারবাবু। ও পুরুষ হিসেবেই বাঁচুক। লোকজন এবং ওর স্কুলেও কেউ জানতে পারবে না। সকলকে বলবে-পেটে টিউমার হয়েছিল কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

—খোকা, আমি এবং তোর মা তোর সঙ্গে একমত। আমরা বংশের মর্যাদা হানি করতে পারবো না।

—বড় হয়ে ও কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না।

—সে তখন দেখা যাবে। এখনকার মতো মান সম্মান বাঁচুক আগে।

নমিতার মতামত কেউ চায় না। সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে, বলে,

—ডাক্তারবাবু যা বলছেন তা করলে হয়না? মেয়ে হিসাবেই ও বাঁচুক না ক্ষতি কি? তবুও তো সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারবে।

সবাই একসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন এবং বলেন,

না, তা হতে পারে না। এতদিন যাকে ছেলে বলে এসেছি তাকে হঠাৎ মেয়ে বলবো এবং সে যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনও করে লোকে তা বিশ্বাস করবে না।

আমাদের বংশ মর্যাদা বড়। নিজেদেরকে অন্যের কাছে ছোট করতে পারবো না।

নমিতা চুপ করে যায়। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে বাবুসোনার পাশে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে এ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, হয়তো সন্তান না হলেই ভালো হতো।

পরেরদিন অমিতবাবু ডাক্তারবাবুর কাছে যান, বলেন-অপারেশন করে নারী অঙ্গগুলি কেটে বাদ দেবেন। ও ছেলে হিসাবেই বাঁচবে।

ডাক্তারবাবু বললেন-আপনারা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ—আমরা অনেক ভেবেছি। এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

—তাহলে আজই ভর্তি করে দিন। কাল অপারেশান হবে।

বাবুসোনা এবং নমিতার কোন মতামত নেওয়া হয়না।

বাবুসোনা অপারেশনের নাম শুনে কাঁদতে থাকে। ঠাকুরদাকে বলে দাদামনি আমার খুব ভয় করছে। এই বলে সে দাদামনিকে জাপটে ধরতে ধরতে যায়। দাদামনি ধমক দিয়ে বলেন—আর ন্যাকামো করতে হবেনা। অনেক হয়েছে। যা ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাই কর।

নমিতা শ্বশুর মশাইয়ের ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে যায়। বাবুসোনা মার কাছে আসে। সে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে, তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বইতে থাকে। মনে মনে বলে-তোর এই অভাগী মাকে ক্ষমা করসি বাবা।

# SMS

**অরিত্র ভট্টাচার্য্য**

"English mother — Good Night Dear
French mother — Bonne Nuit Moucher
Hindi mother — Subho Ratri Beta
Bengali Mother — Ebar ota hath theke kere nie chure fele debo...sute ja bolchi!"

[Courtesy— একটি বহুল প্রচলিত SMS]

'দাদাগিরি'-র সেটে সিলভার রিম পড়া সৌরভ আপনাকে যে প্রশ্নটি করলে আপনি একগাল 'এ তো জানি' মার্কা বিগলিত হাসি হেসে উত্তর দেবেন 'Short message service', সেটি হল 'SMS' কথাটির full form কী? কিন্তু আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, এই ক্ষুদ্র বিলাতি কথাটি এখন ছারপোকার চেয়েও দ্রুত হারে বিস্তার করছে। আপনার চারপাশের দশজন বিভিন্ন বয়সের ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন, দশরকম উত্তর পাবেনই। দেখা যাক কেমন দাঁড়াতে পারে উত্তরগুলো। 'উঠতি' বয়সের ছেলে-মেয়েদের কাছে জানতে চাইলে খানিকক্ষণ আপনার দিকে E.T.-র মতো তাকিয়ে মুচকি হেসে, আপন মনে SMS করতে করতে চলে যাবে। সুতরাং ওই ঝুঁকি না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সেই তরুণ-তরুণীর মা সারাদিন পর তিতিবিরক্ত হয়ে কী বলবেন তার জন্যেই উপরের ছোট্ট SMS-টির অবতারণা। তাই আসুন তাকাই পরিবারের অন্য সদস্যের দিকে। হাজার হোক পরিবার হল বনসাই সমাজ। বয়োজ্যেষ্ঠ গম্ভীর জেঠুর কাছে এটি সমাজ-দূষক, যা সব চ্যানেলের ডাক্তারবাবুদের কাছে চোখ, নাক, কান এমনকি কিডনীর অসুখেরও প্রধান উৎস এবং এর একমেবাদ্বিতীয়ম ঔষধ হল কানে ধরে যন্তরটি কেড়ে নেওয়া। পায়জামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে পিতা বলে উঠবেন, বড় হয়েছে, হাজারবার বলেছি, এখনো না শুনলে (পায়জামার দড়ি দাঁতে ধরে রাখার সামান্য বিরতি) তার ব্যাপার! আর পিসি স্থানীয় মহিলার কাছে এটি 'পিড়িং পিড়িং', অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষা এবং একাধিক টি.ভি. সিরিয়ালের মাঝে বিরক্তি উদ্রেককারী বাজনা। বর্তমানে কয়েকটি ট্রেন এই জিনিসটির T.R.P. এবং সাবধানবানীর volume আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মোদ্দাকথা জিনিসটি প্রাণঘাতী, প্রেম পরিবাহী, চক্ষু-কর্ণ ধ্বংসকারী একটি পরিত্যাজ্য বস্তু।

কিন্তু মজার কথা কি জানেন, রাতে আপনার মেয়ের বাড়ি ফিরতে, বেশী না, এই ধরুন আধ ঘণ্টা দেরী হলে আপনার চেঁচানিতে পোষা টমি সোফা থেকে লেজ গুটিয়ে নেমে যাবে যে একটা SMS করতে অব্দি এদের যে কী হয়! যতই নাক সিঁটকোন, পুজোর ঢাক মেলানোর সাথে সাথে অমুকবাবু শুভ বিজয়া না বললে একবার মনে হয়-ই যে একটা SMS করতে পারলো না! আর যেসব পিতারা 'msg পড়তেই পারি না' বলে অসীম গর্ববোধ করেন, তাদের screen-এ একটা চেনা নাম্বার থেকে msg এলেই ছেলের কাছে হাসি হাসি মুখ করে silent আগ্রহে ফোনটা বাড়িয়ে দেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনার যুক্তি অকাট্য যে ওগুলো তো দরকারী, আদিখ্যেতার পর্যায়ে তো পড়ে না! কিন্তু কি বলুন তো, একটা বিশেষ দিনে ছেলের নাম্বার থেকে 'Happy Father's day... I love you Dad' পেলে একটু হলেও চশমাটা ঝাপসা লাগবে আপনার। দরকার তো নেই, কিন্তু আদিখ্যেতা বলেও কি মনে হবে? সত্তরের দশক তো ভালো ছিলোই, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করে এমন বুকের পাটা কার আছে! কিন্তু সত্তরের দশকে গাড়িঘোড়া, দুষ্টুলোক, পড়াশুনো, tension-এ একটু কম ছিল না! তাই ওগুলো যখন জুটে গেছে, তখন ক্ষমাঘেন্না করে এই তিনটে অক্ষরও না হয় মেনেই নিন। সাবধানবানী তো থাকবেই, কিন্তু তার সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাসটাও থাকবে, অযোধ্যা মামলার রায় বেরোনোর দিনে তার গুরুত্বটাও কিন্তু কম নয়।

# সংস্কৃতিযাত্রা ও বাম-আন্দোলন

**সাম্যদীপ**

সামাজিক পরিকাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সংস্কৃতি এবং একটি সংস্কৃতির আবির্ভাবের জন্য প্রধান ক্ষেত্র যে সমাজ, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ববর্গের সামাজিক সচেতনতা অবশ্যম্ভাবী। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের কিংবদন্তীরা শুধু যে ভাবনা ও চিন্তার যুগলবন্দীতে সমাজ-সচেতন ছিলেন তা নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা কায়িক সংগ্রামে নিযুক্ত থেকে তাঁরা, সাধারণ মানুষের সামাজিক স্বার্থে তাঁদের ভূমিকা কতটা, তা প্রমাণ করেছেন।

এক্ষেত্রে বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। বামপন্থী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক বিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA (Indian Peoples' Theatres Association)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিপতি দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মত মিথ্যাচার পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শোভা সেন, শম্ভু মিত্র, মৃণাল সেন-দের মত মানুষকে চঞ্চল করে তোলে। এরকম বহু মানুষ একসাথে মিলিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে। সেইসব প্রতাপের মুহূর্তে এমনও হয়েছে যে উৎপল দত্তের পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক ঘটক। আর হয়তো সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র-এর মত শিল্পীরা গেয়ে উঠছেন 'ও আলোর পথযাত্রী এ যে রাত্রি এখানে থেমো না.....।' সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে কখনও ১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই-এর ভারতব্যাপী ধর্মঘটের প্রসঙ্গে তাঁরা গেয়েছেন 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ যাচ্ছে....' যে গান বা গানের সুরের অন্তর্নিহিত বক্তব্য-তৎকালীন সমাজে ঢেউ তুলে মানবজাতের চৈতন্যে তোলপাড় করতে সক্ষম হয়েছিল। কিংবা কখনও মর্মস্পর্শী তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা গেয়েছেন 'হেঁই সামালো ধান হো....' যা শুধু নিছক গান হিসেবে পরিচিতিতে আবদ্ধ ছিল না—যা রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন এলাকার মেহনতী কৃষকদের একই সুরে বাঁধা সমবেত কণ্ঠস্বরের ফলদায়ী ব্যঞ্জনায়। দারিদ্রের বন্যায় ভেসে যাওয়া বাঁধনহারা মানবশ্রেণীর মর্মান্তিক জীবনধারা ও তাদের ওপর শোষণকারীদের নির্মম অত্যাচারের যে চিত্র ফুটে উঠেছিল একসময় মার্কসবাদী সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমের ছোঁয়ায় 'হারানের নাতজামাই' রচনাতে সেইরকম করুণ বাস্তব প্রতিফলিত হয়েছিল গ্রামে প্রত্যন্ত প্রান্তে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাট্যরচনায়। এমনই কোনও উদ্দীপনার মুহূর্তে হয়তো কলকাতার কোনও এক থিয়েটারে বুর্জোয়া-সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের প্রকাশে কোন এক নাটক অভিনীত হচ্ছে, যেখানে পুলিশ-চরিত্রের অভিনেতার বদলে আসল পুলিশের আগমন ঘটেছে মঞ্চে এবং তারপর প্রখ্যাত কালী বন্দোপাধ্যায়ের মত আরও অনেক দিক্পালদের সেই পুলিশের হাতে মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে। ১৯৪৮-১৯৫০ সালের ঘটনা। IPTA-র নৈহাটী শাখার প্রধান গায়ক শ্যামল মিত্র-এর বাড়ী ঘেরাও করেছে সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রশাসনের পুলিশ। এদিকে সলিল চৌধুরী ও শ্যামল মিত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পুলিশের আড়ালে; কারণ ধরা পড়লেই গ্রেপ্তার। সলিল চৌধুরী তখন শ্যামল মিত্রের 'friend philosopher and guide' এবং তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, যে কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বে-আইনি হিসেবে ঘোষিত। সেইসব উত্তেজনামূলক মুহূর্তগুলির সাক্ষী বোধহয় সেই মুহূর্তটুকুই কিংবা যাঁরা ছিলেন সেইসব গায়ে কাঁটা দেওয়া মুহূর্তগুলিতে। IPTA আন্দোলন কখনও থেমে থাকেনি—এর পরেও এসেছেন পরবর্তীকালের বহু জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব যেমন অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জ্জী কিংবা গীতিকার-সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত প্রমুখ। সলিল চৌধুরী সৃষ্ট বেশ কিছু নাটক ১৯৭২-৭৩ নাগাদ মঞ্চস্থ করেন অভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায়। সলিলবাবুর দারিদ্র শোষণ-এর সংগ্রাম নিয়ে লেখা 'রিক্সওয়ালা' কাহিনী বম্বেতে ১৯৫৩ সালে 'দো বীঘা জমিন' নামে চিত্রায়িত হয়, যা অবশেষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু IPTA নয়। 'দো বীঘা জমিন' হওয়ার অনেক আগেই ছবির পরিচালক বিমল রায় 'উদয়ের পথে' ছবির পরিচালনা করেন, যে ছবিতে বাঙালী সমাজ প্রথমবার কার্ল মার্কস-এর ছবি দেখে। বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক অন্যতম কারিগর লেখক-শিল্পী সংঘ। এই সংঘের নেতৃত্বে একসময় ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা রবি ঘোষ। IPTA-এর সাংস্কৃতিক বাম-আন্দোলন থেকে প্রভাবিত হয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর উপস্থাপনা করেন, যার প্রথম অভিনেতা ছিলেন নবাগত চিন্ময় রায়। উৎপল দত্তের নাট্যগ্রুপ থেকে রবি ঘোষের মতই অভিনেতা অনিল

চ্যাটার্জীরও অভিনয় জীবনের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। '৯০-এর দশকে একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে তিনি বামফ্রন্ট প্রার্থী হন এবং জয়ী হন। একইভাবে কাশীপুর আসন থেকে বামফ্রন্ট প্রার্থী একবার হয়েছিলেন অভিনেতা অনুপকুমার। কিন্তু তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। যদিও তাঁর উদ্দাম বাম-শক্তি কখনও মাথা নত করেনি। ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ 'অভিনেতৃ সংঘ'-এর পক্ষ থেকে সিনেমা হল্ কর্মীদের স্বার্থে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তুলেছেন সেই সংঘের সভাপতি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গী হন সংঘের সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সহ সম্পাদক অনুপকুমার। অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বহুবার বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় ভুমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর বিদগ্ধ সাংস্কৃতিক মনোভাবের সিদ্ধান্তে বামপন্থার সমর্থনকেই শুধুমাত্র বামপন্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার মাধ্যম মনে করেছেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-তে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথে না এগিয়ে পার্টির পাশে থেকে তিনি যে সহযোগিতা করেছেন তা অবিকল্প। প্রসঙ্গত বলা যায় সৌমিত্রবাবুর এই অভিমত ও কর্মপদ্ধতিকে হার্দিক সমর্থন জানিয়ে ছিলেন প্রয়াত কমিউনিষ্ট প্রাত-স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু।

এইসব ব্যক্তিত্বরা কেউই শুধু মানসিকভাবে বা মৌখিক আলোচনার সাপেক্ষে বামপন্থী ছিলেন না, এঁরা প্রত্যেকেই সুখের বাসনা ত্যাগ করা পথে হাঁটা বামপন্থী—এঁরাই প্রকৃত মার্কসবাদী। সেইকালের এমনই আরও এক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অংশীদার অকৃতদার 'অভিনেতৃ সংঘ'-এর সম্পাদক দিলীপ রায়।

১৯৭৭ সালের পর থেকে 'বামফ্রন্ট'-এর সাফল্য লাভ করার পেছনে শিল্প-জগতের মানুষের অবদান যে স্বল্প নয়, তা পরিষ্কার। এক সময় বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে 'বামফ্রন্টকে জয়ী করুন'—লেখা হোর্ডিং-এ সত্যজিৎ রায়ের নিজের হাতে করা সই কোন না কোনভাবে সাধারণ মানুষকে বামফ্রন্টকে সমর্থন করার সাহস, সান্ত্বনা, বাসনা জাগিয়েছে। আজও নির্বাচনের আগে অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী বা সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখার্জী বা ফুটবলার পি. কে. ব্যানার্জী-র বামফ্রন্টকে সরাসরি সমর্থন করা, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় (অভিযান বলাই ভাল) শিল্পোন্নয়ন দরদী সি.পি.আই. (এম) তথা বামফ্রন্ট-এর সঙ্গে চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার বা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গুলীর পথ চলা, খেলোয়াড় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-এর বামপন্থী দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে অভিনয় করা, কিংবা, বর্তমানের মাননীয়া রেলমন্ত্রীর 'মহানায়ক উত্তমকুমার' মেট্রোরেল স্টেশন উদ্বোধনের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখে, একই দিনে অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জীর কমরেড সুভাষ চক্রবর্তীর স্মরণসভায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিজের উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেওয়া সাধারণ মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে কিছু প্রভাব বিস্তার তো নিশ্চয়ই করে।

প্রকৃত 'সমাজসচেতনা'র অর্থ ত্রিমাত্রিক। এক, সমাজ সম্পর্কে আত্মসচেতনতা; দুই, সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে সমাজ সচেতনতাকে ব্যাপ্ত করা; তিন, সমাজের বৃহত্তম স্বার্থে সমাজকে কল্যাণকামী পথপ্রদর্শন। শিল্পীদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন নতুন নয় এবং তা চিরস্থায়ী। শুধু সচেতন হওয়া নয়, মানুষকে সচেতন করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। সুধীন দাশগুপ্তের কথায় বলা যায়—

'আয় আয় রে ছুটে আয় বাঁধন টুটে—আনি মুক্ত আলোর বন্যা
আয় শুপ্তি ভাঙাই আর শান্তি জানাই
এই শ্যামল ধরণী হবে ধন্যা।
ওই উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙীন ছুটে
আয় রে লগন বয়ে যায় রে মিলনবীন
ওই তো তুলেছে তান
শোন ওই আহ্বান ওই শোন আহ্বান।'

## মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—কেন?

**রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি সকলেরই চেনা। ১৩৪৮-এর ২৫শে বৈশাখ, তাঁর বয়স হলো আশি। সেই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে 'সভ্যতার সংকট' নামে এক ভাষণের শেষে তিনি বললেন:

''আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম—ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট—সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।

আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।"

যে সংকট রবীন্দ্রনাথকে অত পীড়া দিয়েছিল, সে সংকট এখনও কাটে নি। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন নাৎসি বীভৎসতার বাইরের চেহারা। বন্দীশিবিরে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাসচেম্বারে পাঠানোর কথা তাঁর জানা ছিল না। হিরোশিমা-নাগাসাকির গণহত্যা তাঁকে দেখতে হয় নি, কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে বীজাণু ব্যবহারের গোপন হীনতা তাঁকে নতুন করে পীড়া দিতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইওরোপের মাটিতে আর কোনো বড় যুদ্ধ হয় নি, সবই হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বুকে। এখনও যত গৃহযুদ্ধ হয় তা পূর্ব ইওরোপেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিম-ইওরোপের বহু ধনী দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দরাজ হাতে অস্ত্র বেচছে সব পক্ষকেই।

এই পরিস্থিতিতে এখনও কি বলা যায়; মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ?

অথবা আরও ঘরোয়া অভিজ্ঞতায় যাওয়া যাক। আমাদের চারধারে যেসব মানুষকে আমরা দেখি, তাদের দেখে কি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আস্থা তৈরি হয়? একেবারেই স্বার্থমগ্ন আপমতলবি লোকজন, সর্বক্ষণ টাকার ধান্দা—ভালো খাওয়া, ভালো পরা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পরনিন্দা পরচর্চাই এদের একমাত্র বিনোদন, অথবা বুদ্ধু বাক্সর সামনে বসে থাকা।

এই কি ভবিষ্যতের মানুষের আগাম চেহারা?

মূল সমস্যাটা বোঝার ধরণে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—এখানে 'মানুষ' বলতে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষকে বোঝানো হচ্ছে না, ধরা হচ্ছে পুরো প্রজাতিকে। যুক্তিশাস্ত্রে এক ধরণের ভুলকে বলে সংযোগ আর ভাগের ভুল (Fallacy of Composition and Division)। দশজন লোক একটা বোঝা তুলতে পারে, তার মানে এই নয় যে, সেই দশজনের যে কোনো একজনও সেটা তুলতে পারবে। তেমনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—একথাটাও গোটা মানব-প্রজাতির কথা মাথায় রেখে বলা হয়েছে। সমাজে তো রয়েছে কত চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ, ক্যাওড়া-ভাট-লাথখোর। এক এক করে তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কেউ যদি বলেন : এই লোকটাকেও বিশ্বাস করতে হবে?—সেটা হবে ঐ একই ধরনের যুক্তির ভুল। মানুষ বলতে অনেক রকম মানুষ বোঝায়—ভালো-মন্দ-মাঝারি, বিপ্লবী-প্রতি-বিপ্লবী-মধ্যপন্থী, প্রগতিশীল-রক্ষণশীল-গা বাঁচানো—সবাই মানুষ। এদের প্রত্যেককেই সমান বিশ্বাস করতে হবে—এমন উদ্ভট কথা বলা হয় নি।

একদল মানুষই অন্য মানুষের ক্ষতি করে, কিন্তু তারাই গোটা মানব-প্রজাতির প্রতিনিধি নয়। তাদের তৈরি জীবনদর্শনে অনেকেই গা ভাসায়—কিন্তু তারাই মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেয় না। এঁদের বাইরেও অনেক মানুষ থাকেন। যাঁরা স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে চলেন—একদিন-দুদিন নয়, সারা জীবন। তাঁদের জন্যেই এক-একটা সংকট পেরিয়ে যায়। তাঁরাই মানুষের মতো মানুষ। যাঁরা জোয়ারে গা ভাসিয়ে ছিলেন, তাঁরাও ভুল বুঝে ফিরে আসেন। এঁদের ওপর ভরসা করেই রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।'

এরপরেও আসল প্রশ্নটা থাকে। মানুষ বলতে পুরো প্রজাতি বুঝলেও, তার প্রতি বিশ্বাস রাখব কেন? রবীন্দ্রনাথ তার কী ব্যাখ্যা দিতেন বলতে পারব না। আমি কেন বিশ্বাস রাখি সেইটুকুই বলি।

উত্তর এই : একমাত্র মানুষই অভিব্যক্তির ধারায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়। অন্যসব প্রাণীরও অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু তাদের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, অনেক লম্বা মেয়াদে তাদের জৈব পরিবর্তন হয়ে চলে। মানুষ কিন্তু সচেতনভাবে নিজের পরিবেশ পাল্‌টে চলে, বা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এখানেই তার গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল কর্টেকস্-এর ভূমিকা। একেবারে আদিম মানুষ থেকে, অভিব্যক্তির সব স্তরে, মানুষের যত রকমের বিবর্তন হয়েছে, তার সব কিছুর মধ্যেই বড় হয়ে দেখা দেয় তার গুরুমস্তিষ্ক। এরই জোরে শরীরের শক্তি কম হলেও, মানুষের চেয়ে অনেক বলবান জীব তার কাছে হার মানে। সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশে তার সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) কোনো কাজে লাগে না, কাজ দেয় গুরুমস্তিষ্ক।

তেষ্টা পেলে যে কোনো প্রাণীর মতোই মানুষ জল খেতে চায়। কিন্তু বাইরে জলের জোগান না থাকলে, সে মাটি খুঁড়ে জল বার করে আনে। অন্য প্রাণী যেখানে সহজাত প্রবৃত্তির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, মানুষ সেখানে প্রবৃত্তিকে দমন করতে জানে, প্রকৃতির সঙ্গেও লেনদেন চালায়।

এখানেও মনে রাখা ভালো, প্রতিটি মানুষই সে কাজে সমান দক্ষ নন। সকলেই যে তাঁদের গুরুমস্তিষ্ককে সমান পরিমাণে কাজে লাগান—এমনও নয়। কিন্তু, অভিজ্ঞতার

শিক্ষা থেকে অনেকেই বোঝেন; ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যাঁরা শুধু সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলেন, তাঁরা এটা পারেন না।

এমন ধরণের লোকই এখনও পর্যন্ত বেশি। এর পাশে থাকেন, সংখ্যায় কম হলেও, সত্যিকারের মানুষ—গুরুমস্তিষ্ককে যাঁরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেন। তাঁদেরই দৌলতে মানুষ পেয়েছে সুস্থভাবে বাঁচার ও খাটনি বাঁচানোর জন্যে হরেক আবিষ্কার আর উদ্ভাবন—আগুন থেকে কম্পিউটার। অল্প লোকেই এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে গোটা প্রজাতির উপকার করে এসেছেন। এঁরাই মানুষের ভরসা। এঁদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে ও বাড়ছে। এঁরা আছেন বলেই মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই।

গুরুমস্তিষ্ক ব্যবহারের একটি সুফল আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই দেখতে পাই। তার নাম; শুভবুদ্ধি। আত্মরক্ষা আর প্রজাতি সংরক্ষণ—একাজ তো সব জীবই করে। প্রকৃতির তাড়নাতেই মা বাঁচায় তার সন্তানকে—এমনকি নিজের জীবনকেও তখন সে তুচ্ছ করে। কিন্তু মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধি করেই প্রজাতিকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকে সুগম করার জন্যে রেখে যায় অজস্র উপকরণ। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সে গড়ে তোলে বসত—ঝড়-বৃষ্টি তাপ-শীত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে নিজের ও তার উত্তরপুরুষের।

এর পাশাপাশি নিশ্চয়ই আছে আর একদল মানুষ, যাঁরা শুধু ধ্বংস করতেই পারে। রাজ্য বিস্তারের লোভে রাজার সেনাবাহিনী পুড়িয়ে দেয় অন্য মানুষের আস্তানা। মুনাফা থেকে অতিমুনাফার লোভে তারা বিষিয়ে তোলে পরিবেশকে—ক্ষতিকর রাসায়নিক জিনিস দিয়ে; বর্তমানের লাভের জন্যে মাটি করে ভবিষ্যৎ। একে বলা যায়; অশুভবুদ্ধির অত্যাচার।

কিন্তু শুভবুদ্ধি তো হার মানে না। ধর্ম নিয়ে যখন দাঙ্গা বাধে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়—যত অল্পই হোক—শুভবুদ্ধির শক্তি। এই শুভবুদ্ধি দেখা দেয় প্রতিটি সংকটের সময়ে—যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, মন্বন্তরে। এই শুভবুদ্ধিই মানুষকে শিখিয়েছে বীজধান আগলে রাখতে, প্রতিবছরই জমি না-চষে, দু-একবছর ফেলে রাখতে—যাতে জমির উর্বরতা নষ্ট না-হয়। আজ পণ্যসর্বস্ব পুঁজিবাদ সেই শুভবুদ্ধিকেও গ্রাস করতে চায়। কিন্তু অতীতের ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি; যত দুর্বলই হোক, শুভবুদ্ধিকে গলা টিপে মারা যায় না। সাময়িক বিপদ যতই বড় হয়ে দেখা দিক, তা সাময়িকই। শুভবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত জিতবেই।

মানব-প্রজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাশ হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। সমস্যা এখন আরও গভীর হয়েছে, সংকট দারুণ। তবু প্রজাতি হিসেবে মানুষের যে বিশেষত্ব তার প্রতি বিশ্বাস হারানোর কোনো কারণ নেই। তার উদ্ভাবন-ক্ষমতা তো হারিয়ে যায় নি। মারণাস্ত্রের পাশাপাশি চলছে দুরারোগ্য রোগের ওষুধ তৈরির চেষ্টা। কত তাড়াতাড়ি মুনাফা-শিকারিদের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায়—ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও রুখে দাঁড়ানো যায় তার বিরুদ্ধে—এখন তার ব্যবস্থাই করতে হবে।

# খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে

## চম্পা সেন চৌধুরী

কথায় আছে, ''খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।'' সত্যিই কোনও কালে কোন তাঁতি গরু কিনে বিপদে পড়েছিল কি না সে কাহিনী আমরা অজানা। আমি কেবল প্রচলিত এই উক্তিই শুনে এসেছি এত কাল। কিন্তু আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি—ঘটনা, উপমা বা বাক্যালংকার যাই হোক—অনুভূতির কোন্ গভীর থেকে উঠে এসেছে কথাটা। বুঝতে পারছি প্রতিদিন, প্রায় প্রতি পদক্ষেপে।

এই ধরা যাক না চিঠির ব্যাপারটা! কি প্রতিক্ষিত ছিল দিনের দুই বিশেষ সময়ে পোস্টম্যানের আবির্ভাব—মনে পড়ে?" আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম/রঙিন খামে যত্নে লেখা আমার নাম"—এই খাম আমার, আপনার, সবার। গানটি বসন্তের হাওয়া বইয়ে দেয় না কি মনে? শুধু খাম কেন? সময় মত পোস্টম্যানের হাত থেকে অথবা দিনের কাজের শেষে বাড়ি ফিরে চিঠির বাক্স খুলে বার করা একটা ইনল্যাণ্ড-লেটার বা একটা পোস্টকার্ডও কি খুশি ও প্রশান্তির দোলায় দুলিয়ে দেয়নি মন? বাড়িতে না ঢুকে সকাল বিকেল সামনের পথ দিয়ে ডাক-পিওনের চলে যাওয়া কি উদাস করে তোলেনি মনকে? ''ডাকঘরে''র অমলের মত রাজার চিঠির অপেক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে না কি 'আমাদের' সকলের ভেতরকার শিশুটি? (রাণারের দিনে) রাণারের ঘন্টার ঠুনঠুন

শব্দের জন্য কান পেতে থাকা—গল্প গানের ভেতের দিয়ে—আমাদেরও।

কিন্তু আজ? ই-মেল ও এস.এম.এস-স্বপ্নের সেই রঙিন দেশ থেকে বাস্তুহারা করেছে আমাদের—পত্র রচনা নামক শিল্প জগৎ থেকে উধাও। সেই আবেগ ও অবকাশ এ যুগে দুর্মূল্য। বাঁধা সময়ের সব বাঁধন কাটিয়ে আজ আমরা মুক্ত। আর পোস্ট অফিসের বাক্সে চিঠি ফেলে দিয়ে বসে থাকা নয়। অতএব ক্যুরিয়ার। First Flight, Professional, DTDC, Blue Dart, DHL আরও কত কি! এছাড়া রয়েছে Speed Post এর ব্যবস্থা। যার যেমন প্রয়োজন, যেমন সামর্থ্য, যেমন সুবিধে।

প্রশ্ন, তাহলে গেলটা কি? এত বিকল্প ব্যবস্থা! কিন্তু যা গেল, তা মাপব কি দিয়ে? ছিঁড়ে গেছে সময়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা অভ্যাস-প্রসূত শৃঙ্খলা, ভেঙে গেছে নিশ্চিন্ত অবসর, ভুলে গেছি বিশ্রাম। হারিয়ে গেছে চিন্তা প্রসূত বুদ্ধির রসে জারিত আবেগ যা চিঠির মাধ্যমে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলত —সময় অনেক অবাঞ্ছিত আবেগকে শৃঙ্খলিত করতে সাহায্য করত। আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে, কিন্তু বোধের রসে জারিত হওয়ার সময়াভাবে সবটাই তাৎক্ষণিক আবেগ সম্বলিত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অর্থহীন। যেমন হৃদয়ের গভীর থেকে তা উঠে আসবার সুযোগ পায় না, তেমনি মনের গভীরে রেখাপাত না করে তা হারিয়ে যায়। মানুষে মানুষে সম্পর্ক তাই আজ হারিয়েছে তার গভীরতা। এত সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাড়ছে একাকীত্ব, বাড়ছে দূরত্ব, বাড়ছে অসহায়তা।

এখন অধিকাংশ চিঠি আসার কোন বাঁধা সময় নেই। ভাগ্যবান না হলে নিজেদের অনুপস্থিতিতে চিঠিও কোন চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়—ফিরে আসা অবধি নীরবে চিঠির বাক্সে অপেক্ষা করে না। অতএব সারাদিন উৎকণ্ঠ থাকা—দিনের সে কোনও সময়ে বেজে উঠতে পারে কলিং বেল—বিশেষতঃ নিঝুম দুপুরে। এক দেড় ঘন্টার মধ্যে ছ'বার বেল বাজিয়ে ছ'টা ক্যুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে এল ছ'খানা খাম। না, কোন প্রিয়জনের হস্তাক্ষরে কুশল বিনিময় নয়—সস্তার ফোল বা ই-মেলের যুগে এই বিলাস অযৌক্তিক—এ চিঠি ব্যাঙ্কের, অফিসের, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর, কোন প্রতিষ্ঠানের বা বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, পৈতে, জন্মদিন, শিল্প বা কারু-প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ-পত্র। দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছিলেন— গেল তার আমেজটা কেটে। অসুস্থ বা বয়স্ক মানুষের অসুবিধে হবারই কথা। কিন্তু দিনের এই সময় তারা ছাড়া খুবই কম লোকই বাড়িতে থাকে যে! ''অলস দুপুর'' শব্দটাই উধাও হবার যোগাড়।

না, এতেই শেষ নয়, এরপর আছে ফোন। সুবিধের জন্যে সেল ফোন। অতি ব্যস্ততার মুহূর্তগুলোতে বারবার বেজে উঠতে থাকবে সেটা। ঠিক সেই সময়েই আপনাকে গান শোনানোর অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ফোন কোম্পানীর তরফে। কখনও গান শুনিয়ে এন্টারটেন করা, কখনও হ্যালো টিউনের ব্যবস্থা অথবা ''একাকীত্ব'' থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বাত্লে দেয়া, নিদেনপক্ষে ক্রিকেট বা ওয়ার্ল্ড কাপের খবর সরবরাহ করা। কখনো ব্যক্তিকণ্ঠ, কখনও রেকর্ডেড মেসেজ কখনও টেক্স্ট! কি? আপনার অসুবিধে হচ্ছে? এত বেরসিক হলে কি চলে? তাহলে সেল ফোল রাখা কেন?

এবার ঠিক দুপুরের নিস্তব্ধতা (যদি একটুও অবশিষ্ট থেকে থাকে) ভঙ্গ করে বাজল ল্যান্ড ফোন। ''হ্যালো!, হ্যালো!, হ্যালো!'' ওপারের নৈশব্দ ভেঙে সাড়া এল চার-পাঁচ বার হ্যালো বলার পর। তারা যে একই সঙ্গে অনেককে নিয়ে ব্যস্ত! না, কোন আত্মীয়-বন্ধু বা শুভার্থী নয়; কারণ তারা জানেন এসময়ে আপনাকে বিরক্ত করা উচিৎ নয়—ফোনটি এসেছে কোন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট ইন্সুরেন্ট কোম্পানী অথবা ফোনের কোম্পানী থেকে। আপনার মঙ্গল কামনায় তাদের ব্যাকুলতার প্রমাণ স্বরূপ নূতন নূতন স্কীম, নূতন সাহায্য প্রকল্প আপনার কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়ে দেয়া! উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু আপনার হাতে মোটা টাকা না থাকলে ব্যাঙ্ক নাচার! তবে সময় তো আছে! সেটুকুই দিয়ে এই মহৎ উদ্দেশ্য শুনতে ক্ষতি কি আপনার? চাই কি, আপনার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন তো হয়ে যাচ্ছে! কি? আপনি সিনিয়র সিটিজেন, রিটায়ার্ড—শুধু একটু স্বস্তি চান, শান্তি চান? ''আরে, এই জন্যেই তো ফোন করা! কেবল আপনাদের কথা চিন্তা করে।'' বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজারের যুগে আপনার অবকাশ, বিশ্রাম সবই তো অন্যের পণ্য!

সেদিন এক অভিনব অভিজ্ঞতা। বহুদিনের প্রতীক্ষার পর নীরব টেলিফোন সবে সরব হয়েছে। কন্যার সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত আমি। পিক্ পিক আওয়াজে বুঝতে পারছি অন্য কেউ ফোন করার চেষ্টা করছে। উপেক্ষা করেই কথোপকথন সারতে লাগলাম—নিকটতম দেশে সর্বোচ্চ মূল্যের আই.এস.ডি—কম সময়ে যতটা প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেয়া যায়! সেই আওয়াজ থেকে গিয়ে এবার পাশের ঘরে সেল ফোনটা বেজে উঠল। ভাবলাম, বাজুক, আমার ফোনে কল-ইন-ওয়েটিং ব্যবস্থা থাকাতে বাড়ি নেই ভেবে সেল ফোনের নম্বরও জানে এমন কেউ ডাকছে—এখানে কথা সেরে তাকে ফোন করব। একবার থেমে আবার বেজে উঠল সেল ফোন। আর উপেক্ষা করা গেল না—কারও খুব

প্রয়োজন, হয়ত কোন এমার্জেন্সি—উদ্বিগ্ন হয়ে ল্যান্ড লাইনে মাঝপথে কথোপকথন বন্ধ করে দৌড়ে এসে এ ঘরে সেলের বোতাম টিপে কানে ধরেছি, ওপার থেকে রেকর্ডে কণ্ঠ শুনতে পেলাম, "is currently busy" ব্যাপারটা বোধের দরজায় পৌঁছবার আগেই কাঁপাকাঁপা রেকর্ডেড কণ্ঠ, ''যে বি, এস, এন, এল, নম্বরটি আপনি ডায়াল করেছেন, সেটি আপাততঃ ব্যস্ত আছে।" রাগ-দুঃখের অতীত—শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য মনে মুঠো ফোনটি মুঠোয় ধরে বসে পড়েছি আমি—আবছা স্বর ভেসে আসতে লাগল কানে, "The B.S.N.L. number you have dialled is currently busy."

---

# কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সঞ্চয় চেতনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

**জগন্নাথ রায়**

বৈচিত্রময় পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক-এর বিচিত্ররূপ যেমন দেখা যায় তেমনি আবার এই সকল কারণে বিচিত্র সব ব্যাধির জন্ম হয় যা মানব সভ্যতাকে অনেকাংশে আপাতঃ পঙ্গু ও জর্জরিত করে তোলে। বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উপাদানগুলি ক্রমশঃ তার উৎকৃষ্টতা হারিয়ে ফেলছে, ফলে নানাধরনের রোগ জীবানুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে সারা বিশ্বে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যে অসাধু ব্যবসায়ীদের কৃপণ হস্ত পণ্য সামগ্রীকে সতেজ রাখা ও ওজন বৃদ্ধির কারণে নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য মিশিয়ে চলেছে যা মানব শরীরে রোগের বাসা বাঁধছে। যেমন ধরুন কয়েকদিন আগে 'প্রতিদিন' পত্রিকায় পড়ে দেখলাম যে, চা-এ এখন একপ্রকার পাতা মিশানো হচ্ছে যা নাকি ক্যানসারের কারণ হতে পারে, এইভাবে চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যে ও নানা ধরনের অস্বাস্থ্যকর জিনিষ মেশানো হচ্ছে। ইদানিংকালে আমার-আপনার পরিচিত গণ্ডীতে দেখবেন বেশ কিছু গুরুতর রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। যা চিকিৎসা শাস্ত্রের পন্ডিতদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। বর্ত্তমান আর্থ-সামাজিক যুগে অর্থের সংকট যে সকলের মিটে গেছে একথা বলা যায় না। বরং অধিকাংশ শ্রমজীবি মানুষের অর্থ সংকট তীব্রতর হয়েছে নানাবিধ কারণে। রোগব্যাধি সবসময় সকলের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত, তবুও বলি যারা কিনা তথাকথিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন তাদের মধ্যে রোগ-ব্যাধি হলেও অর্থের প্রাচুর্য হেতু বড় বড় নার্সিং হোমে বা বিদেশে সু-চিকিৎসা করার সুযোগ থাকে। ফলে রোগী রোগকে পরাস্ত করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। যদি ও কথায় আছে ''নিয়তি ক্যেন বাধ্যতে"। কিন্তু যারা শ্রমজীবি গরীব গুর্বো মানুষ, তাদের কাছে কঠিন ব্যাধি শুধু দুঃর্বিসহ ও পীড়া দায়ক নয়, তার পরিবারের কাছেও অসহ্য এবং মৃত্যু যন্ত্রণার সামিল, কারণ অর্থহীনতায় জীবন বিপন্ন প্রায়। আধুনিক আজকের এই দিনেও মানুষের সচেতনার অভাবে হোক কিংবা প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক কারণে হোক টিবি, প্লুরিসি ডায়বেটিস্, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ও মানব জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এইসব রোগ দীর্ঘ মেয়াদি ও শারীরিক ভাবে মানুষকে সাময়িক এমনকি পুরোপুরি অক্ষম করে দিতে পারে। বহুকাল আগে এইসব রোগের প্রকোপে মানুষ প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় নানাধরনের প্রতিষেধক ও যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষ এইসব রোগে আক্রান্ত হলেও জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারছে। জটিল এইসব রোগ থেকে মুক্ত ও সুস্থ থাকতে দরকার সঠিক সময়ে চিকিৎসা। এরজন্য প্রয়োজন আর্থিক সঙ্গতি ও রোগ সম্বন্ধে সম্যক ধারণার। আর্থিক সঙ্গতির প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভরণ-পোষণের খরচ এত বেড়ে গেছে যে, পরিকল্পনামত অর্থ সঞ্চয় না করলে এধরনের খরচের মুখোমুখি হওয়া ভীষণ কষ্টকর। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও অসামাজিক ব্যয় যাতে একেবারে না হয় তার দিকে গৃহকর্তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ও সঞ্চয়ের পরিমান যথাসম্ভব বাড়াতে হবে শ্রমার্জিত অর্থ থেকেই।

এক্ষেত্রে বিশেষ করে ভারত সরকারের শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে যেমন ধরুন—Provident Fund, ESI etc. এই দুটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি এই কারণে যে আমরা (অর্থাৎ TMC Group-এর অধীনে যারা কর্মরত) যে সংস্থায় চাকরী করি সেই সংস্থায় PF ও ESI-এর সুযোগ সুবিধা প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই আছে।

PF এর সুযোগ-সুবিধাগুলি হল—(১) কর্মচারী ও শ্রমিক বন্ধুরা ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত ভাবে মূলবেতনের থেকে ১২% টাকা ও তার সাথে সংস্থার দেওয়া ১২% মোট = ২৪% টাকা জমা রাখতে পারেন, যা কিনা সুদসহ চাকরীর অন্তে ফেরৎ পাওয়া যায়। (পেনশানের অংশটুকু বাদ দিয়ে)। (২) ১০ বছর চাকরীকালের পর এই প্রকল্পে পেনশানের আওতায় আসা যায় এবং চাকরীর শেষে 'অবসর গ্রহণ' থেকে জীবিত কাল পর্যন্ত মাসিক পেনশন্ পাওয়া যায়। এমনকি প্রকল্পভুক্ত সদস্যের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত পুত্র/কন্যার জন্যও পেনশান্ এর ব্যবস্থা হয়। (৩) প্রয়োজনীয় লোন এই Fund থেকেও পাওয়া যায় সুদ ব্যতীত। যেমন—গৃহঋণ, বিবাহজনিত ঋণ, অসুস্থতাজনিত ঋণ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে কেন্দ্রিয় সরকার এই প্রকল্পের সুদের হার ৯.৫% ও প্রাপ্ত সুদ সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন ৬.১২.২০১০ তারিখে। ফলে কষ্টার্জিত অর্থ বাহিরে না রেখে PF-এ রাখাটাই শ্রেয়। PF সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনেক রয়েছে এখানে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করছি না। তবে PF প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ টানতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের এক কর্মীবন্ধু ৺গোপাল বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর দিশেহারা একটা পরিবার প্রায় বানের জলে ভাসতে থাকে। একাধারে দৈনন্দিন রুজি রোজগারের পথ বন্ধ ও অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সন্তানের শিক্ষার বোঝা—এই টালমাটাল অবস্থায় তখন একমাত্র ভরসা ছিল PF এর গচ্ছিত টাকা সুদসহ ফেরৎ পাওয়া এবং মাতা-পুত্রের মাসিক পেনশন্ পাওয়া, যা কিনা মাঝ দরিয়ায় তরী ডোবার আগেই PF-এর সঞ্চয় প্রকল্প তীরে এনে ভেড়াল তাদের প্রায় ডুবন্ত তরী-টিকে। রোগ সম্বন্ধে সম্যক ধারনার প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, কর্মক্লান্ত জীবনে সবকিছু বুঝে পথ চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে তবুও সচেতনাতার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ESIC (Employees State Insurance Corporation) এর সাহায্যে বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। আজকের পয়সা নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে ভাবে অর্থই চিকিৎসা ব্যবস্থায় মূল চাবিকাঠি বা পরিমাপ হিসাবে গৃহীত হচ্ছে সেখানে সত্যিকারের নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ESI এর মাধ্যমে চিকিৎসা করার একটা উৎকৃষ্ট পন্থা হতে পারে। ESI-এর বিশেষ কয়েকটা সুযোগ-সুবিধা হল যে, (১) কর্মচারী-বন্ধু নিজে ও তার পরিবারবর্গের জন্য চিকিৎসা পাবেন। (২) হসপিটালে থেকেও চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে (৩) অসুস্থতাজনিত কারনে, দুর্ঘটনাজনিত কারনে, শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারনে 'ছুটির জন্য' এই প্রকল্প থেকে শ্রমিক কর্মচারী বন্ধুরা নির্দিষ্ট হারে টাকা পেতে পারেন। [(৪) কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও বার্ষিক ১২০ টাকার বিনিময়ে ESI Card-টিকে জীবিত রাখা যায় এবং সদস্যসহ পরিবার ভুক্ত সদস্য রোগ-ভোগের জন্য ঔষধপত্রসহ সুচিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়]—এইভাবে এই প্রকল্প অসময়ের বন্ধু হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে দু'একটা উদাহরণসহ সুযোগ-সুবিধাগুলি বোঝানোর চেষ্টা করছি। —প্রথমতঃ আমাদের কারখানার এক শ্রমিকবন্ধু রঙ্গলাল কয়েক মাস আগে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। সাথে সাথে ওনাকে ESI Hospital-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের সুচিকিৎসা ও পরামর্শে কিছুদিন চিকিৎসা পাওয়ার পর এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। কিন্তু কথাটা হল এইধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগে চিকিৎসার ভার দুঃর্বিসহ করে তোলে, এক্ষেত্রে ESI-এর মাধ্যমে চিকিৎসার ফলে অর্থের প্রয়োজন হয়নি বললেই চলে। কিন্তু অপর পক্ষে আমার আর এক বন্ধু প্রায় একরকম রোগের শিকার হবার পর ESI-এর পরিবর্তে ব্যক্তিগত অধীনে চিকিৎসার ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। এই আর্থিক খরচের ফারাক থেকে বোঝা যায় যে, ESI-এর গুরুত্বটা কতখানি। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, অল্প খরচে বা বিনা পয়সায় ESI প্রকল্পের দ্বারা সু-চিকিৎসা বর্ত্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সব সময় শিক্ষা নেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে আর একটা উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। সেটা হল—আমাদের কর্মচারী বন্ধু শ্রীশক্তিপদ জানার স্ত্রী প্রকৃতির নির্মম কষাঘাতে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকটা বছর ধরে জর্জরিত। প্রথমে তিনি গ্রামীন হসপিটালে প্রাথমিক চিকিৎসার অধীনে ছিলেন, তাতে তেমনভাবে সাড়া পাননি। পরবর্তীকালে সংস্থার পক্ষ থেকে ESI-এর মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে Ray দেওয়ার জন্য বেশ আর্থিক খরচের প্রয়োজন। ESI এর মাধ্যমে Medical College Hospital-এ উন্নত মানের যন্ত্রের সাহায্যে এসব করা সম্ভব হয়েছে। রোগ জর্জরিত পরিবারের সীমাহীন যন্ত্রণা সম্পূর্ণ লাঘব করা না গেলেও ঔষধপত্রের জন্য খরচের বোঝা অনেকটা লাঘব করা গেছে এটা অনস্বীকার্য। ESI এর ডাক্তারের অধীনে থেকে একটা সময় পর্যন্ত উনি ভাল ছিলেন। এইভাবে দুঃসময়ের সাথী হিসাবে ESI (Benefits) সুযোগ সুবিধা অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। বর্ত্তমানে ESI ব্যবস্থার আধুনিকীকরনের ফলে 'প্যাহচান কার্ড' (Smart Card) চালু হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ESI অন্তভুর্ক্ত সদস্যগণ দুটো Smart Card পাবেন।

প্রথমটা নিজের জন্য ও দ্বিতীয়টা পরিবারবর্গের জন্য-এর সুবিধাগুলি হল যে, এটা একটা Bank এর ATM Card এর মতো। এই কার্ডের সাহায্যে Card Holder তার Insurance সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারবেন। দুটো Card আলাদা থাকার সুবাদে একই সময়ে ভিন্ন জায়গায় থাকা অবস্থাতেও পরিবারবর্গ ও সদস্য চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। পরিবারের ফটো সহ সফল তথ্য এই Card এ নিবদ্ধ থাকবে ফলে পরিবারের লোকেরা যে কোন Dispensary থেকে পরিষেবা পাবেন। কোন কারণবশতঃ কর্মচারী অর্থাৎ ESI সদস্য সংস্থাগত পরিবর্তন করলেও এই Smart Card এর কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না ইত্যাদি। ESI কর্তৃপক্ষের Smart Card একটা আধুনিক পরিষেবার মধ্যে পড়ে। এছাড়া আমাদের মতো SSI Unit-এ সম্পূর্ণ ভাবে সংস্থার উদ্যোগে LIC-এর মাধ্যমে Gratuity Scheme আছে। এর ফলে শ্রমিক কর্মচারী বন্ধুরা অন্ততঃ পক্ষে ৫ বছর চাকরী করার পর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী Gratuity পাবেন। ইতিমধ্যে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন বা কাজ ছেড়ে চলে গেছেন তারা প্রত্যেকে Gratuity-র থেকে টাকা পেয়েছেন।

চাকরী অন্তে অবসর জীবনে PF এর মতো Gratuity ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে PF, ESI, Gratuity, Pension সবেরই ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু তথ্য আছে যা এখানে লেখা দীর্ঘায়িত হবে বলে উল্লেখ করা গেল না। অবশ্য অনেক কর্মচারী ও শ্রমিক বন্ধুরা এসব ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি যে, TMC Casting এর থেকে অবসর নিয়েছেন এমন দু একজনের Pension From Fill up করতে গিয়ে দেখি যে, যাদের বছরের ছুটির পরিমান খুব বেশী, আইন বিধি অনুযায়ী তাদের Pension Fund এর ভান্ডারে আঘাত এসেছে। অর্থাৎ যা Pension পাওয়া উচিত ছিল তার থেকে সামান্য হলেও কম Pension পাবেন। এটা ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সত্যিই ক্ষতি করবে। এক্ষেত্রে আমার একটাই আবেদন যে, প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সজাগদৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

## কিভাবে ভালো থাকবেন, আপনার কাজের জায়গায়

**সুব্রত ভট্টাচার্য্য**

কিভাবে আমরা বা আপনারা ভালো থাকবো যার যার কাজের জায়গায়, এটা যদিও নূতন কোন বিষয় নয় তবুও কিভাবে আরো ভালো থাকা যায় বা খুশীতে থাকা যায় সেটাই আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া।

এই সম্বন্ধে বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু যতটা সংক্ষেপে মূল গ্রহণযোগ্য বিষয় যেগুলি মানুষের মনস্তত্ত্বের সাথে জড়িত সেগুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি ভালো থাকবার উপায়গুলিকে Pointwise সাজানোর চেষ্টা করছি। যেমন—

a) হঠাৎ করে কারুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দুরের প্রচন্ড সফলতাকে স্বপ্ন না দেখে আজকের কাজ, আজকের ব্যবহার, আজকের সময়কে গুরুত্ব দেওয়া (দিন থেকে রাত)। যদি সম্ভব না হয় তবে Next 5-6 ঘন্টা কীভাবে ভালো কাটবে বা তাও না হলে আগামী ১ ঘন্টা কীভাবে কাজ করে ভাল থাকা যায় তার চেষ্টা করা।

b) যে শহরে থাকছেন, যেখানে থাকছেন, যে জায়গায় কাজ করছেন নিশ্চয় তার কিছু Positive বা ইতিবাচক ব্যাপার থাকেই, চেষ্টা করুন সেগুলো খুঁজে বের করে পূর্ণমাত্রায় তা ব্যবহার করতে। নিজে লাভবান হবেন।

c) চেষ্টা করুন Predictive Mode বা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আচরণে বেশী থাকতে, Reactive Mode বা প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে কম থাকতে। একটু বলি, অনেক কিছুর মধ্যে মানুষের মন বেশীর ভাগ সময় হয় Predictive অথবা Reactive mode এ থাকে। Predictive অর্থাৎ কোন কথা, ঘটনা বা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত চিন্তা করা এবং পরে কাজে এগিয়ে যাওয়া আর Reactive অর্থাৎ এইগুলির কোনটাই মাথায় না রেখে Action নিয়ে ফেলা বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়া। একটু ধৈর্য্য ধরুণ। Reactive হওয়ার আগে একবার ভাবুন।

d) যে সমস্ত মানুষ শুধুই অন্যের খারাপ ব্যবহার বা খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করছে তাদের সাথে কম আলোচনা করুন। একান্তই কথা বলতে হলে সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা ইত্যাদি একটু বড় বিষয় নিয়ে কথা বলুন।

প্রতিদিন কিছুটা শরীরচর্চা করুন। শরীরচর্চা বা প্রাণায়ামের দ্বারা আপনার শরীরে যে পরিমাণ অক্সিজেন ঢুকবে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যাবে তাতে আপনি অনেক বেশী প্রাণবন্ত (Energetive) অনুভব করবেন। কারণ অক্সিজেনের দ্বারাই আমাদের বিভিন্ন হরমোনের মাত্রা তার ভারসাম্য বা Balance ঠিক থাকে। যে হরমোন বা নিউরোট্রান্স মিটারগুলিই আমাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আচরণের কারণ। এছাড়া রক্ত চলাচল ঠিকঠাক থাকলে অনেক অঙ্গের জটিলতা হ্রাস পায়। যারা তাও পারবেন না তারা কিছুটা সময় Nature বা প্রকৃতির সঙ্গে কাটান, তাহলেও উপকার পাবেন। ভুলে যাবেন না আমরা এই Nature থেকেই উদ্ভুত।

e) কাজের জায়গায় আপনার কাজটা ঠিকভাবে সময়ের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করুণ। নতুন কাজ মন দিয়ে শিখে ফেলুন। এতে করে একটা Positive energy আপনার ভেতরে তৈরী হবে। যাতে থাকবে আত্মতৃপ্তি এবং আত্মবিশ্বাস, যেটা সহজেই হবে অনুকরণীয় অন্যদের কাছে এবং বারংবার এই Practice আপনাকে গড়ে তুলবে সুদক্ষ কর্মী বা Master হিসাবে।

f) ঠিকভাবে কথা বলুন এবং ঠিকভাবে শুনুন ঃ এটি একাট ভীষণ উপকারী পন্থা কিন্তু আমরা কেউই follow করি না বা গুরুত্বও দিই না। কথা বলার সময় ঠিক ঠিক শব্দ পরিস্কার করে ঠিকভাবে যদি উচ্চারণ করতে পারেন (Proper pronunciation), দেখবেন ম্যাজিকের মত কাজ হবে অন্যদের কাছ থেকে। এবারে শোনার ক্ষেত্রেও তাই। কখনই কারুর কথা বুঝে শুনবেন না। আগে কথা শুনুন পরে বলুন। অর্থাৎ চরিত্র অনুযায়ী বিচারের চেষ্টাটাকে তাহলে দূরে রাখতে পারবেন। আর আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক সংস্কৃতি বা অবস্থার কথা ভেবে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হবেন না কখনই কেননা, আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, সততা, পরিশ্রমের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা কারোর থেকে কম কিছু নয়।

g) এবারের যে বিষয়টি নিয়ে বলব, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি মনে রাখতে পারলে আমাদের অর্দ্ধেক দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তা হল -- এ জগৎ পরিবর্তনশীল। এই অমোঘ সত্য আমরা জেনেও বুঝতে চাই না। বুঝতে চাই না বলেই আমরা এত অস্থির পৃথিবী একই নিয়মে চললেও পৃথিবীর প্রতিটি জীব এবং জড়বস্তু নিত্যই পরিবর্তিত পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি, আপনি, আপনার বাড়ি লোকজন, পোষা কুকুরটা, টবের ফুলগাছ, আপনার গাড়ীটা সব সবাই পাল্টে যাচ্ছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আপনার দাঁত হবার পর থেকে মাজেন প্রতিদিন মাজেন, কিন্তু প্রতিদিন কি একইভাবে দাঁত মাজেন? রোজ কি একই পরিমান পেস্ট নিতে পারেন আপনি? পারেন না। তাহলে আপনি নিজে যখন এক থাকতে পারছেন না প্রতিদিন, তাহলে তো অন্যরা পাল্টে যাবেই। এটাই ভীষণ স্বাভাবিক, Natural। অন্য মানুষের ব্যবহার পাল্টে গেলে তাই অবাক হবার কিছু নেই। তাই সবসময় কাজ নিতে হবে বাস্তব থেকে, স্মৃতি থেকে নয়। অর্থাৎ fact বা Reality থেকে, Memory থেকে নয়। কেননা Memory তে যেটা ছেপে রয়েছে সেটাতেই বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ঠোক্কর খেতে হতে পারে বারবার। Memory তো help করবেই Automaticaly কিন্তু সেই Help-টা বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতটা কাজ করবে সেটাও যাচাই করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি দেখুন, শুনুন, Check করুন, এতে আপনার সতর্কতা বাড়বে। দ্রুত বুঝতে পারবেন পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে না প্রতিকূলে যাচ্ছে।

h) সদা সতর্ক থাকার চেষ্টা করুন। সর্তক মানে কিন্তু ভীত বা আতঙ্ক গ্রস্থ নয়।

i) Stage বা মঞ্চ থেকে Audience বা দর্শকাসনে যান। মঞ্চে যারা অভিনয় করেন তারা কিন্তু পুরো নাটকটাকে দেখতে পান না, তারা তাদের নিজেদের Dialogue বলেন এবং নির্দেশিত বা আগের শেখা রিহার্সাল করা অভিনয়টাই করেন। এখানে যদি মঞ্চটাকে পরিস্থিতি ধরে নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমি সেই পরিস্থিতিতে আমার পুরানো অভ্যাসের মতই Dialogue আওড়ে যাচ্ছি। একবার নিজেকে পরিস্থিতির বাইরে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। দেখবেন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

j) প্রতিটি কাজে প্রতিটি পরিশ্রমের পেছনেই সাফল্য, সুখ বা সাচ্ছন্দ্য আশা করবেন না। সফলতা কিছুটা পরেও আসতে পারে। এবারে শেষে, সবচেয়ে চর্চিত বা বর্তমান যুগের আলোচিত বিষয় নিয়ে বলি। আজকের যুগে খুবই পরিচিত শব্দ Stress বা Pressure বা কাজের চাপ। চাপ বা Stress নিয়ে সারা পৃথিবী আজ আলোড়িত। Stress Management নিয়ে আমার লেখা আপনাদের কাছে হয়ত খুবই বাসী পুরানো মনে হবে তবুও একদম সহজ ভাষায় আসল কথাটা ছোট করে বলার চেষ্টা করছি। Stress বা Load বা Pressure কিন্তু একটি আপেক্ষিক শব্দ। জানবেন চাপ তখনই চাপ যখন আমার বা আপনার সেই চাপ নেবার ক্ষমতাটা কম। চাপ কিন্তু কাজ শুরুর সাথে সাথেই হয় তখন কিন্তু বলি না। তাই চাপের দিকে না দেখে ক্ষমতার দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু আমরা উল্টোটা করি। চাপটাকে কম করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি, সুযোগ এবং ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে দিই। খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমি Stressed হচ্ছি তখনই নিজের ক্ষমতা বা Capability বাড়িয়ে ফেলতে হবে। কি করে? দক্ষতা বাড়াতে গেলে প্রথমে

একটু সময়ের জন্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। এবারে আপনার ভুলগুলিকে (Mistakes) চিহ্নিত করুন। যেইমাত্র চিহ্নিতকরণ বা Identified হবে সঙ্গে সঙ্গেই Error correction ব্যাপারটা আমাদের Brain-এ কাজ শুরু করবে, automatic solution এর Resource বা সম্ভাব্য সুযোগগুলিকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করবে। Identify করতে হবে ভুল ছাড়াও কে, কোন ঘটনা, কোন পদার্থ, কোন গন্ধ আপনার বিরক্তির কারণ বা তারা আপনাকে উদ্বেগ বা Anxiety তে ফেলে দিচ্ছে না তো? সঠিক চিহ্নিতকরণ করে তবেই কাউকে কিছু বলুন। Stress বা চাপকে ফেলে রাখা যাবে না বা বাড়তে দেওয়া যাবে না কেননা এর গভীরতার পরিণাম আত্মবিশ্বাস হারানো এবং ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এক অবষাদগ্রস্ত রোগীতে পরিণত (Depression) হওয়া। কারুর এমন হলে এগিয়ে আসতে হবে অন্যদের। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মানুষই পারে মানুষকে সুস্থ করে তুলতে।

আজ শেষ করলাম। উপরিউক্ত রচনার কথাগুলো অনেকেরই জানা। তবুও যদি আপনাদের কোন উপকারে লাগে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

---

# TMC-R&D টেম্পার কারখানার নবতম সংযোজন

**দেবাশীষ সরকার**

R & D কথাটার পুরো অর্থ হল Research and Development —অনুসন্ধান ও বিকাশ। কোন একটি বিষয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা এবং অনুসন্ধান লব্ধ ফলাফলের দ্বারা বিষয়টির বিকাশ সাধন করা। ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক রান্নার কড়াই। প্রথমে ঢালাই লোহা (Cast Iron) দিয়ে এই কড়াই তৈরী হোত। কড়াইগুলো ছিলো বেশ ভারী, কড়াইয়ের উপরিতল ছিলো তুলনায় কম মসৃণ। কড়াই গরম করতেই অনেক তাপ ব্যবহার হয়ে যেতো, কড়াইয়ে রান্নার পরে যে দাগ পড়ত তা পরিষ্কার করাও ছিলো বেশ কষ্টকর। এই সমস্যাগুলো সমাধানে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ঢালাই লোহার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই বাজারে এলো। এই কড়াইগুলো তুলনায় অনেক হাল্কা। অনেক কম তাপ ব্যবহার করেই রান্না করা যেত। কড়াইয়ের উপরিতল তুলনায় বেশী মসৃণ হওয়ায় রান্নার পরে সহজেই পরিষ্কার করা যায়। পরে গেলে ঢালাই লোহার কড়াই ভেঙ্গে টুকড়ো টুকড়ো হয়ে যেত, অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইয়ে সেই সমস্যাও আর রইলো না। পরবর্তীকালে স্টেনলেস স্টীলের কড়াইও বাজারে আসে ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে। কড়াই নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানের (Research) জন্যই এই বিকাশ সম্ভব হয়েছে। আজকে ঢালাই লোহার কড়াই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কোন ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গেলে দুটো জিনিষের সঠিক যোগসূত্র রচনা করা প্রয়োজন। Theory (পুঁথিগত জ্ঞান) এবং Practice (ব্যবহারিক জ্ঞান)। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলতঃ পুঁথিগত বিদ্যার লালন পালন বেশী হয়। আবার কল কারখানায় চর্চিত হয় মূলতঃ ব্যবহারিক জ্ঞান। R&D কেন্দ্রগুলোতে মূলতঃ এই দুটি বিদ্যার সঠিক বিয়োজন প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার অনুসন্ধান অথবা শুধুমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিমার্জন কোন সফল বিকাশ (Development) হওয়া সম্ভব নয়। প্রযুক্তি বিদ্যার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধরণের R&D কেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে, যা সঠিক অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নয় আবার উৎপাদন ক্ষেত্রও নয়। কোন জিনিষের ব্যবহারকে পর্যবেক্ষন করে প্রথমে ব্যবহারের দুর্বল দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। দুর্বলতাগুলোকে কাটানোর জন্য Theory-র সাহায্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে হয়। তারপর এই পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হয় ব্যবহারিক বিদ্যার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ল্যাবরেটরির মধ্যে। ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত বস্তুটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করে দেখতে হয় পূর্বে নির্ধারিত দুর্বলতাগুলো কতটা উন্নত হয়েছে। ফল সন্তোষজনক না হলে পুনরায় পূর্বের পদ্ধতিগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হয়। ফল সন্তোষজনক হলে জিনিষটিকে কারখানায় উৎপাদনের উপযোগী করে প্রকাশ করতে হয়।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ক্ষেত্রে, metallurgical field-এ failure analysis করে আসছি। এই ব্যাপারে আমি সাঁকো-র সপ্তম সংখ্যায় উল্লেখ করেছি। Failure Analysis করে আমরা কোন failure এর কারণ অনুসন্ধান করেছি এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাথমিক কিছু উপায় নির্দেশ

করেছি। Failure যদি ব্যবহারের ভুলের জন্য হয়ে থাকে তা হলে একরকম, কিন্তু যদি ব্যবহৃত পদার্থের কোন দুর্বলতার জন্য হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে পদার্থের বিকাশ সাধনের প্রয়োজন হয়। এই জায়গায় আমাদের কোন ভূমিকা ছিলোনা। অথচ এই কাজ করার মত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অনেকটাই আমাদের আছে। তা ছাড়া এই কাজের সূত্র ধরেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটালার্জিকাল ও মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের IIPC (Industry Institute Partnership Cell) ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, IIT (Indian Institute of Technology) খড়্গপুরের মেটালার্জিকাল ও মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, IIT খড়্গপুরের Steel Technology Centre এর সঙ্গে, National Metallurgical Laboratory (NML), Jamshedpur এর সঙ্গে, Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI) এর সঙ্গে। আমাদের দেশে metallurgical field-এ গবেষণায় ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান অপরিসীম। আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রাথমিক উৎসাহ দেখিয়েছে। ভারত সরকারও শিল্পক্ষেত্রে R&D কর্মকান্ডকে উৎসাহদানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

খুব বড় শিল্প সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেও কোন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে, পরিকাঠামোতে দুর্বলতার কারণে এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখা যায়নি। তাছাড়া ছোট উদ্যোগের দৈনন্দিন সমস্যা কাটিয়ে এই ধরণের কাজকর্মকে বাতুলতা বলেও মনে করা হয়। আমরাও এই চিন্তার বাইরে ছিলাম না। কিন্তু একজনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আমাদের এই ধারনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে গত বেশ কয়েকবছর ধরে। তারপর এ বছর যখন তিনি আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সময়ের জন্য যুক্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের R&D বিভাগের জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই। আজকে আমাদের দেশে metallurgy field এর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ, প্রফেসর বিমল চৌধুরী। মূলতঃ প্রোফেসর চৌধুরীর নিরবচ্ছিন্ন এবং হাল-না-ছাড়া প্রচেষ্টাতেই জন্ম হয়েছে এই বিভাগের। আমরা গর্বিত, প্রোফেসর চৌধুরী এই বিভাগে সর্বক্ষণের director হিসাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আস্তে আস্তে পথ চলা শুরু হয়েছে এই বিভাগের। এখনও পর্যন্ত যেটুকু পথ এগানো গিয়েছে তা হল,

১। সোদপুরে R&D-র একটি ছোট অফিস খোলা হয়েছে।

২। বেসরকারী সংস্থা, M/s. Banerjee & Banerjee, Kolkata-এর আর্থিক সহায়তায় এক বছরের একটি Project এর কাজ শুরু হয়েছে, "Structural Steel এর Corrosion হ্রাস করার জন্য উন্নততর মানের Coating এর প্রয়োগ"—এই শীর্ষক।

৩। একটি উন্নতমানের মাইক্রোস্কোপ (Carl Zeiss Germany make) কেনা হয়েছে।

৪। IIT Kharagpur এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে Alternative to Hard Chrome Plating" এই শীর্ষক একটি project এর প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

৫। ISEC (Institute of Science, Education & Culture) এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "Survey on Vocational Education in India"—এই শীর্ষক একটি project ভারত সরকারের Planning Commission এর অনুমোদনের জন্য পাঠানোর প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

পথ চলা শুরু হয়েছে। কতদূর যেতে পারবো ভবিষ্যতই বলবে। আমরা তো আশাবাদী, আশা নিয়েই শেষ করছি এই লেখাটি।

---

# আমি কেন ধর্ম মানি না

**শ্যামল চ্যাটার্জ্জী**

> "ঝুঁকি নিতে হবে সব বোঝার জন্য
> পৃথিবীর সব বাঁধা
> আরোহণ করো-আগুয়ান হও
> পরোয়া না করে বাঁধা।"
>
> (ফিরদৌসি, তাজিক কবিতার সংকলন)

এ বড় অদ্ভুত দায়। 'ঈশ্বর নেই' প্রমাণ দিতে হয় তাদের, যারা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তাদের। আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা তাদের 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করার যুক্তিটা ভারী অদ্ভুত। বেদ বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের প্রমাণ্য। কিন্তু এই সব গ্রন্থের বয়স ছয় হাজার বছরের বেশি নয়। একথা শিক্ষিত

অশিক্ষিত গোঁয়ার গোবিন্দ সকল মানুষই স্বীকার করবেন যে ছয় হাজার বছরের আগেও মানুষ ছিল। তাহলে আমাদের বলা উচিত ছয় হাজার বছর আগে ঈশ্বর ছিল না। এইখানে তাদের যুক্তি জম্পেশ। তাদের বক্তব্য, ছিল কিন্তু লিপিবদ্ধ ছিল না। এছাড়াও আরো একটা বক্তব্য ঈশ্বর বিশ্বাসীদের অছে। তা হলো, ''বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর''। মোদ্দা কথা, এসবে কোন যুক্তি নেই, আছে শুধু কল্পনা ভিত্তিক বিশ্বাস।

''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'' এই কথা ধরেই এগোনো যাক। মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে যুক্তিকে নির্ভর করে। আমি যদি বলি, ঘোড়ার ডিম আছে। আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন কি? নিশ্চয় না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসীরা ঈশ্বর প্রমাণের দায় এড়াতেই ঐ অদ্ভুত বাক্যের অবতারণা করেন। এছাড়াও ঈশ্বর বিশ্বাসীরা কোন বির্তকে তো যেতেই চান না। বরঞ্চ, কোনঠাসা হয়ে গেলে তাদের নখ দাঁত বের হয়ে আসে তাদের শান্তির আলখাল্লার ভিতর থেকে। এর উদাহরণ আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। যেমন সক্রেটিশকে হেমলক পান করতে হয়েছিল, জিওদ্রানো ব্রুণোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, আর্কের জোনকেও তাই, গ্যালিলিওকে করা হয়েছিল চির গৃহবন্দী। উদাহরণ আছে আমাদের দেশেও মানে এই বাংলাতেও। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকেও প্রচুর হেনস্থা হতে হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল তারা ধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। দোহাই ধর্মীয় আচার আর ধর্মকে আলাদা করবেন না। কারণ, আপনাদের ঐ ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যই ধর্মীয় আচারবিধি। ধর্মের সেই হিংস্র চরিত্র আজও বর্তমান। এর বৃত্তান্ত এখানে নিষ্প্রয়োজন। এবার ভূমিকার ভণিতা ছেড়ে প্রসঙ্গে আসা যাক।

ধর্মের উৎপত্তি অজ্ঞানতা এবং ভয় থেকেই। মনে হয়, কথাটা ঠিক বলা হলো না। ধর্ম নয় ঈশ্বর চিন্তার উৎপত্তি অজ্ঞানতা বা ভয় থেকে। আদিমকালে মানুষ প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তখনকার মানুষের ধারণা ছিল এই সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য কারণ ঘটে কোন আধাভৌতিক কারণে। সেখান থেকেই ঈশ্বর চিন্তা। পরবর্তীকালে সংখ্যাগুরুর উপর মুষ্টিমেয়ের আধিপত্য কায়েম করার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মের সৃষ্টি। আবার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অন্তবিরোধ ও নানাবিধ কারণেও বহু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মর সৃষ্টি হয়। যুক্তি বা অনুসন্ধিৎসাই প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে সমস্ত কিছু কার্যের কারণ খোঁজার দিকে চালিত করে। আর এইখান থেকেই বিজ্ঞান চিন্তার শুরু। সুতরাং বলা যেতেই পারে অ-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর যাত্রা শুরু একই সময় থেকেই।

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মের রূপ ও চরিত্র-ও বদলায়। সমাজ বদলের হাত ধরেই জন্ম হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জানিয়ে রাখি ধর্ম-র কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে মূলত দুইটি কারণে, এক) অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও দুই) উন্নত চিন্তার সঙ্গে সংঘাত। ধর্ম চিন্তার এই চিন্তার পরিবর্তনকে মূলতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১) আদিম, ২) প্রাচীন, ৩) ঐতিহাসিক, ৪) প্রাক্-আধুনিক আর ৫) আধুনিক। এই আধুনিক ধর্মের সৃষ্টি হয় নি। এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি 'ঈশ্বর' জাতীয় কিছুর কোন স্থান নেই। ভিত্তি হবে মূল্যবোধ।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের তিনটি অঙ্গ আছে। ১) বিশ্বাস (belief) ২) প্রার্থনা (worship) এবং ৩) সংগঠন (organisation)। ধর্মের সাংগঠনিক রূপটি কিন্তু শুরুতে ছিল না। প্রাক্ আধুনিক ধর্মের যুগে এটি চূড়ান্ত রূপ পায়। পৃথিবীতে যত প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমত আছে তার কোনটার বয়স ৩০০০ বছরের বেশি নয়। হিন্দুধর্ম ৩০০০ বছর। যদিও হিন্দু ধর্ম কী? তার উত্তর জানা নেই। 'বেদ'কে ভিত্তি করে এই ৩০০০ বছর। আমার মতে 'হিন্দু ধর্ম' কে বৈদিক ধর্ম বলা উচিত। খ্রীষ্টধর্ম ২০০০ বছর, ইসলাম ১৩০০ বছর, বৌদ্ধ ধর্ম ১৪০০ বছর ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম মতালম্বী হিন্দু। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা তা অদৌপেও মানতে রাজী নয়।

**বিবর্তনের কিছু কথা ঃ** আজ থেকে প্রায় দেড়-দু হাজার কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আজকের এই পৃথিবী। সৃষ্টিলগ্নে পৃথিবীর চেহারা বা প্রকৃতি (character) আজকের মত ছিল না। বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পদার্থে পরমাণু-অণুর সৃষ্টি হয়। এরপর বহু কোটি বছর কেটে যায়। প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর মাটি সৃষ্টি হয়। এই সময়কালকে বলা হয় প্রিক্যামবিয়াল যুগ। আরো দেড়শ কোটি বছর পরে অর্থাৎ তিনশ কোটি বছর আগে জন্ম হয় এক কোষী প্রাণের। এরপর কেটে যায় আরো ২৬ কোটি বছর পৃথিবীতে সৃষ্টি বহুকোষী প্রাণীর এইভাবে বহুঘাত প্রতিঘাতের মধ্য এই বিবর্তন ক্রিয়া চলতে থাকে। এই সময় বহুপ্রাণীর সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে লুপ্তও হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ডাইনোসর। মানুষের সৃষ্টি এরও বহু কোটি বছর পরে। যে যুগকে বলা হয় নব ভূ-তাত্বিক যুগ। বলাটা বোধহয় এরকম হওয়া উচিত নব-ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষ পর্বে মানব জাতির ''আদি রূপ। সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুগের বয়স সাড়ে ছ কোটি বছরের কাছাকাছি। মানুবজাতির সৃষ্টি কাল বা বিবর্তনের সময় প্রায় চার কোটি বছর। আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর পূর্বে

মানুবজাতির এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হল। মানুবজাতির পূর্বসুরী এক বিশেষ জাতের বানর দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখল বা বলা যেতে পারে পরিবেশের তাগিদে হাত হল মুক্ত। এই এদের থেকেই মানবজাতির পূর্বপুরুষের পিথেকানথ্রোপাস বা বনমানুষের সৃষ্টি। এখানে বলে রাখা ভাল যে এদের বা এদের আগের পূর্বসুরীদের আমরা ''আদিমানুষ বলে চিহ্নিত করি না। করি-নিয়ানডারভ্যাল দের। যাদের আর্বিভাব আজ থেকে দেড় লক্ষ বছর আগে। নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন আসে, নিয়ানডারথ্যালদের আগের ধারাকে আদি মানুষ বলে চিহ্নিত করি না কেন? কারণ নিয়ানডারথ্যাল-এর আগের ধারা অর্থাৎ পিথেনগনথ্রোপাস বা আরো আগের পূর্বসুরীদের মস্তিষ্কে চেতনার স্তর ছিল সাধারণ জীবজন্তুর মতো। নিয়ানডারথ্যালরা প্রথম চিন্তা ভাবনা করে এবং তাকে সুসংহত করার চেষ্টা করে। এই চিন্তা ভাবনা আরো সমৃদ্ধ হয় আজ থেকে মাত্র ৪০ হাজার বছর আগে, পৃথিবীর আধুনিক মানুষ (নিশ্চয় কোট-হ্যাট পরিবৃত নয়) হিসাবে যারা পরিচিত, ঐ ক্রোম্যাগনন-মানুষের আমলে। নিয়ানডারথ্যালের আগের পূর্বসুরীরা সর্বদা ব্যস্ত থাকত তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ (Struggle for existence)। ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনের কারণেই তাদের চিন্তা ঘুরপাক খেত। তারা প্রকৃতি ও তার কারণ সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। কিন্তু সর্বদা সচেতন বা সজাগ থাকতো নিজেদের প্রয়োজনে। কারণ তাদের কখনো লড়াই করতে হত অপর গোষ্ঠী হিংস্র পশুদের সাথে, আবার কখনো নিজেদের বাঁচাতে প্রকৃতির বিরূপতার জন্য (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি)। এই কারণগুলি সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের ছিল না। কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তারা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা সুসংহত রূপ পায় নিয়ানডারথ্যাল আমলে। এই ঘাত-প্রতিঘাত থেকে প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজার শুরু।

নিয়ানডারথ্যাল বা তার আগের আমলেও মানুষেরাও ছিল যাযাবর ও গোষ্ঠীবদ্ধ। তাদের মধ্যে কোন পারিবারিক সম্পর্ক ছিল না। যৌনমিলন ছিল অবাধ। শিকারই ছিল জীবন নির্বাহের মূল উপায়। কোন শ্রেণীও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারল, এই যাযাবর জীবনযাপনের পরিবর্তন দরকার। কারণ স্থান পরিবর্তনের সাথে ভৌগলিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং নতুন নতুন সংঘাত টিকে থাকার পক্ষে অসুবিধাজনক। তাই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করতে লাগল। প্রাথমিককালে তারা চাষবাস জানত না, তাই তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না। এই চেষ্টাই তাদের কৃষি কাজ করতে শেখায়। এই 'কৃষি'-চিন্তা মূলতঃ নারীদের থেকে এসেছে। কারণ তাদের জীবন থেকেই তারা এটা বুঝতে পারে কিংবা ধারণা করা হয় যে তারা যখন কোথাও স্থায়ীভাবে অনেকদিন থাকত, সেখানে তারা ফল-মূল খেত। আর সেই ফলের আঁটি বা বিচি তারা অদূরেই ফেলত। সেখান থেকেই আবার সেই নির্দিষ্ট ফলের গাছ বেরোতো। আর আমার নিজস্ব ধারণা এই যে তারা মনে করত ঐ অভুক্ত বা খাবার অযোগ্য আঁটি বা বিধির কোন সৃষ্টি ক্ষমতা নেই। কিন্তু ঐ আঁটি বা বিচি থেকে যখন আবার গাছ হত সেখান থেকেই তাদের ধারণা জন্মায় যে মৃত্যুর পরও জীবন আছে এবং তার জন্ম আছে, পরজন্ম তত্ত্বের ভ্রূণ বলা যেতে পারে। তাই এই চিন্তার উন্মেষ ও নিয়ানডারথ্যাল আমলেই প্রথম দেখা যায়।

হ্যাঁ এখানেই অদিম বা আদি ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তার শুরু। তাই এখানেই শেষ করছি বিবর্তনের কথা। যদিও বিবর্তনের ইতিহাস আছে অনেক বড়। আমাদের মূল আলোচনার বিষয়েও বিবর্তনের কথা আসবে বা আসতে বাধ্য। কারণ বিবর্তন আজো চলেছে এবং চলবে। এটা কোন আজ-কাল-পরশুর গল্প নয়, এই বিবর্তন কাল অতিক্রম না করলে উপলব্ধি হয় না বা বোঝা যায় না। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হবে। ধরা যাক আজ একটা কালো ছাতা কেনা হল। কিন্তু সময়কালে তার রঙটা পরিবর্তন হয়ে পাংশুটে বা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এই পরিবর্তনটা ঠিক সাধারণভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয় না। ধরা সময় অতিক্রম করার পর। যাই দ্বিতীয় পর্বে।

**আদিম ধর্ম ঃ** আগেই বলেছি যে নিয়ানডারথ্যাল আমলের মানুষেরা প্রথম চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। পণ্ডিতেরা দেখছেন এই নিয়ানডারথ্যালদের মস্তিষ্কের আয়তন পিথেকানথ্রোপাসদের তুলনায় ৪০০-৫০০ ঘন সেন্টিমিটার বড় এবং কোষগুলির মধ্যকার সম্পর্কও জটিল। এই সময় কোন ভাষা ছিল না, ছিল কিছু সংকেত আর দৈহিক ভাবভঙ্গী। যা দিয়ে একজন অন্য একজনকে তার ভাব প্রকাশ করত। আগের পর্বেই বলা হয়েছে যে এই নিয়ানডারথ্যাল মানুষের মধ্যেই ধর্মের বা 'ঈশ্বর' চিন্তার ভ্রূণ প্রকাশ পায়। এদের কাছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক কারণগুলি ছিল অজানা। তার ভাবত এ সমস্ত কিছু কোন এক শক্তিধরের ক্রিয়া কর্ম। সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা সেই বিশেষ ব্যক্তি। একথা সর্বজনগ্রাহ্য এই বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একভাবে হয়নি বা সম্ভবও ছিল না বিভিন্ন

অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এই বিবর্তন বা বিকাশ হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে যখন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। তা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে তাই অলৌকিক শক্তিধরের নামকরণও হয়েছে বিভিন্ন। যেমন ওসামনিয়ায় 'খানা'। অস্ট্রেলিয়ার রাতাপা, কোথাও গড আবার কোথাও ব্রহ্ম। প্রাচীন যুগে জন্ম-মৃত্যু কিংবা প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে, সেই ধারণাকে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদেরা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। (১) সর্বপ্রাণবাদ--পুরা প্রস্তর যুগের শেষভাবে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগের মানুষেরা সমস্ত জড় বস্তু মধ্যে প্রাণ বা শক্তি আছে মনে করত। কোন কারণে পাহাড়ে থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর কারো প্রাণহানি ঘটিয়েছে। তখন পাহাড় আর পাথর, উভয়েরই শক্তি আছে বলে তারা কল্পনা করেছে। সেই ধারাকে কেন্দ্র করে পাথর কিংবা নদী ইত্যাদিকে পূজা। এছাড়াও প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক শক্তির কল্পনা করত। এই ধারণাই সর্বপ্রাণবাদ। পরবর্ত্তীকালের ''পরমেশ্বর''-এর অঙ্কুর।

(২) টোটেমবাদ--যদিও ধর্ম নয়, তবুও টোটেমবাদ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। টোটেম হচ্ছে বিশেষ কোন গাছ বা প্রাণী। যা কোন মানুষ বা মনুষ্যগোষ্ঠীরর পূর্বপুরুষ। সর্বত্র এই চিন্তাধারার প্রভাব পাওয়া গেলেও তারমধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। এই চিন্তার কয়েক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন বিশেষ নাম বা প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা। একে হত্যা করা খাওয়া এমনকি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। একে অনুকরণ করে বেশ কিছুর আচরণ-বিধিরও সৃষ্টি।

পরবর্ত্তী যুগে এই চিন্তার নানাবিধ পরিবর্ত্ত রূপ দেখা দিয়েছে। যেমন হিন্দুরা গরুকে পূজা করে, গোমাংস খায় না। যদিও ঋক বেদে গোমাংস ভক্ষণের কথা উল্লেখ আছে। হনুমান উপাসনা, বা মুসলিমরা শুয়োর খায় না। গরু বা শুয়োর না খাওয়া হয়তো পশুরক্ষার তাগিদ থেকে এসেছে। কিন্তু আজকের অনেক মুসলীম বিশ্বাস করেন না মানুষ চাঁদের মাটিতে নেমেছিল, এই কারণেই।

(৩) ম্যাজিক--প্রথমে বলি ''ম্যাজিক'' কথাটির অর্থ কি? the use of charms spells etc in seaking or foretending to control events of forces. (webstor-New world dictionary).

মোদ্দা কথায় এক বিশেষ ধরণের আবেদন কোন বিশেষক্ষেত্রে তারা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে, বিচিত্র ভাবে চিৎকার করে তাদের কল্পিত অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা করত। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে ঐ আদিম যুগের মানুষের কাছে তাদের ঐ কল্পিত অলৌকিক শক্তির রূপ মঙ্গলময় ছিল না, ছিল দানবের। ঐ ভয় থেকে জন্ম হয়েছিল অনুসন্ধিৎসার বা কৌতুহলের আবার অপর দিকে ভগবানের। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে সময়কালের নিরিখে বিচার করতে গেলে তাদের ঐ বিশেষ ধারণা কিন্তু ঐ সময়ের বিচারে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার।

ফ্রয়েডের মতে কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটু অন্য ধরণের। তিনি বলেছেন প্রকৃতির প্রতিকূলতার হাত থেকে রক্ষার জন্য আদি মানুষেরা কিছু আচরণবিধি ঠিক করে। যেমন কোন বিশেষ ফল শরীর খারাপ করে, ভূমিকম্পের সময় গুহায় থাকা নিরাপদ নয় ইত্যাদি, কিংবা (গ্রহণ) সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল বা খালি চোখে (গ্রহণ) দেখার জন্য চোখ নষ্ট হয়েছিল, দিন-রাত্রি সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ এই সব মিলিয়ে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক নিয়ম ঠিক করেছিল। আবার সর্বত্র এক নিয়ম ছিল না, বা থাকাও সম্ভব নয়। বহু বহু বছর ধরে এই দেশে আসা এই নিয়মই ফ্রয়েডের মতে ধর্মের প্রাথমিক স্তর।

যাইহোক, একটা জিনিস পরিষ্কার মানব সভ্যতার বিকাশের নির্দিষ্ট কারণেই মানুষ নিজেই 'ধর্ম বা ঈশ্বর তৈরী করে।'

এবার কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আর একটু ভাবা যাক। যেমন ভাষা সৃষ্টির আগে তারা নানা ধরণের অঙ্গভঙ্গী বা সংকেত ব্যবহার করত। ছবি এঁকেও তারা তাদের ভাব প্রকাশ করত। আবার বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টি বা শব্দ সৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করত, বিপদ সংকেত জানাতো কিংবা ঐ কম্পিত শক্তিকে তুচ্ছ করত। আবার অঙ্গ-ভঙ্গী করেও এই চেষ্টা চালাত। একটু চিন্তা করলেই আমরা সবাই বুঝতে পারব যে আমরাও সেই সংকেত বা শব্দ এখনও বহন করে নিয়ে চলেছি। যেমন উলু দেওয়া কিংবা শঙ্খ বা শিঙা বাজানো ইত্যাদি। আর সংকেত পাঠানো আজো অনেক আদিবাসীদের মধ্যে চালু আছে। যেমন আন্দামান-এর জারোয়া কিংবা আফ্রিকার অনেক উপজাতির মধ্যে। দেখুন, ঐ ফুটবলে-হুইসেল কিংবা ক্রিকেটে আম্পায়ারের হাত/আঙ্গুলে নির্দেশ বা সংকেত ঐ ধারাকেই বহন করেছে। অঙ্গভঙ্গী করে কম্পিত অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট করত বা প্রার্থনা করত। পরবর্ত্তীকালে তারই উন্নতরূপ নৃত্য। এর উদাহরণ বিভিন্ন পুরানে বা মহাকাব্যে অথবা অন্যান্য কাব্যে আমরা দেখেছি। যেমন ''ইন্দ্র''র রাজাসভায় মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি নৃত্য-পটীয়সিদের বা মনসা মঙ্গল কাব্যে ইন্দ্রের রাজসভায় বেহুলার নৃত্য। দেবদাসীদের কথাও বলা যেতে পারে। যার অস্তিত্ব আজও বর্তমান। মানুষ যখন ভাষার ব্যবহার শিখল,

তখন ঐ শক্তিধরের বন্দনার নতুন সংযোজন ঘটল সংগীতের মধ্য দিয়ে। পরে এই সংগীতও উন্নত রূপ পায়। তার সফলতম উদাহরণ সামবেদ। বলা যেতে পারে ঐ আদি মানুষের গুহার গায়ে ছবি আঁকা সংকেত ইত্যাদি আজকের নৃত্যকলা, অঙ্কন বা সংগীতের ভ্রূণ।

এখানে আরেকটা ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা হলো, সেই সময় কোন শ্রেণী ছিল না, ছিল না কোনো জাতপাত বা বর্গের বিভাগ। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সামাজিক কারণে এর উৎপত্তি হয়। ফলে ঈশ্বর বা ধর্মের কোন নির্দিষ্ট আকার ছিল না। তাই, তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের সৃষ্টি কর্তার কাছে তারা ছিল সমান। এই ধারণা গড়ে ওঠার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে সেই সময় তারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল না। তাদের জীবন নির্বাহের মূল ছিল শিকার। তাই তারা শিকার করে যা আনত তাই ভাগ করে খেত। উদ্বৃত্ত থাকত না বা থাকলেও তাকে ষ্টোর করার কৌশল তাদের জানা ছিল না। সেই সময় 'ঈশ্বর' চিন্তা এবং তাকে ঘিরে যে সব আচরণবিধি ছিল, তা কখনই প্রভুত্বের হাতিয়ার হিসাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না। তাদের চিন্তা যতই ভ্রান্ত হোক বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যত হাস্যকর মনে হোক, —বরঞ্চ নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে তারা চিন্তা করেছিল প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য কি? তাই রহস্যের অনুধাবণ করতে গিয়ে তাদের অবস্থান থেকে ঐ অনুমানই আসা স্বাভাবিক।

এর ঠিক পরবর্তীকালে মানুষ ছোট-খাট কৃষিকাজ করতে থাকে। আগেই বলেছি, মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয় বা যখন ব্যাপারটা সুসংহত রূপ পায় তখন এরা অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী একটা নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক থাকতে শুরু করে। একে ঘিরে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে ওঠে। পরিবেশ ও বিভিন্ন প্রতিকূলতা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন স্থানের ঐ গ্রামগুলির কাঠামো বিভিন্ন হতো। যেমন, কাঠ বা বাঁশের বেড়া পরিবৃত বা গ্রামের চারিপাশে পরিখা কাটা ইত্যাদি আবার গ্রামের ঘরগুলি মাচার উপরও হত। সম্ভবতঃ বন্যপশু কিংবা বন্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। আর এই ঘটনার বা এই সামাজিক পরিবর্তনের শুরু ১০ হাজার বছর আগে এবং ৫-৬ হাজার বছর আগে তা সুসংহত রূপ পায়। তাহলে যদি সময়ের দিকে তাকাই তবে একটা জিনিষ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, যে এই সময়ই প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের চারাগাছটি বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ এর পরবর্ত্তীকালেই কিন্তু সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের জন্ম। সত্যি কথা এই সময় সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কারণ মানুষ কৃষিকাজ করতে শুরু করে। ফলে মানুষ চেষ্টা করতে থাকে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং সংগ্রহ করতে। কারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার দ্বারা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করেছিল যে সব সময় (all the season) ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। এই যুগের ঠিক আগে মানুষ আগুনের আবিষ্কার করে। বলাটা অস্বাভাবিক ধরণের ভুল হল, বলা উচিত আগুনের ভীতি কাটে এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শেখে। যে অলৌকিক শক্তিধরের রূপ ছিল অপদেবতা তার রূপ পরিবর্তন করল খানিকটা অর্থে। কারণ আগুনও ছিল তার কাছে দেবতা। আর যা ছিল অধরা, অজানা। তা যখন নিজের প্রয়োজনে অসে, তার রূপ মঙ্গলময় হতে বাধ্য। আর এই আগুনও স্থান পেল তাদের ধর্মীয় আচরণ-বিধি। যার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বৈদিক ধর্মের হোম। হ্যাঁ, এই যুগেই মানুষ ভাষার ব্যবহার শেখে।

হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার একটু আগে বললে ভালো হত। কিন্তু এখন বললেও ক্ষতি নেই। আমরা জেনেছি যে নিয়ানডাররথ্যাল আমলে প্রথম মৃত্যুর পরই শেষ নয় বা আত্মার চিন্তা আসে। তাই সেই সময় কবর দেওয়ার পদ্ধতি চালু ছিল। শুধু তাই নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া থাকত, তার উপকরণের নিদর্শনও ঐতিহাসিকেরা পেয়েছেন। এই পদ্ধতি দেখেই অনুমান করা যায়, মৃত্যুর পর আরেক ধরণের জীবন আছে কিংবা পরজন্ম আছে এই ধরণের ভাবনা-চিন্তা সেই সময়কার মানুষেরা করত। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও শ্রাদ্ধর সময় নানাবিধ উপকরণ বা সামগ্রী দেওয়ার প্রচলনও এই ধারণা থেকে।

তাদের কল্পিত শক্তির রূপ অপদেবতা ছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই তারা যখন শিকার বা অন্য কোন কাজে যেত, তখন ঐ কল্পিত শক্তির উদ্দেশ্য বা কল্পিত শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য প্রার্থনা বা ম্যাজিক পদ্ধতি প্রয়োগ করত। আবার ঐ কাজে সফল হলে তাকে অভিনন্দন (congratulation) জানাতো নানাধরণের অঙ্গভঙ্গী করে (থাকে আদিম নৃত্য বলা যেতে পারে)। কিংবা পুরো ঘটনাটা কিভাবে ঘটল সেটা ভাব-ভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশ করে (যাকে আদিম নাটক বলা যেতে পারে)। এই সমস্ত কিছু জানাতে পারা গেছে সেদিনকার গুহাচিত্রের মাধ্যমে। কল্পিত দেবতার রূপও যে অপদেবতার ছিল তারও প্রমাণ ঐ গুহা ছিল। দেখা গেছে একজন বিকট মূর্তিকে অনেকজনের নতজানু হয়ে প্রার্থনা বা নৃত্যের ছবি।

যাইহোক, এবার ফিরে যাই ঐ সমাজ বিবর্তনের কথায়। হ্যাঁ ঐ জায়গায় যখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, কৃষি উৎপাদন সক্ষম হয়েছিল, সেই সময়। অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যভাগের কিছু পরে বা শেষ ভাগের দিকে।

মানুষ আবিষ্কার করল ধাতু। যদিও ধাতুর আবিষ্কার সর্বত্র একভাবে হয়নি বা হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভৌগোলিক কারণ অনুযায়ী আকরিক সর্বত্র থাকে না। এই প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। এর আগে নব্য প্রস্তর যুগে ধর্মের ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনও আসে সুনির্দিষ্ট সামাজিক কারণে। তাহলে কারণটা কি?

মানুষ তখন স্থায়ী গ্রামের সৃষ্টি করেছে। শ্রমের নিরিখে মানুষের মধ্যে একটা বিভাজন হয়েছে। যেমন একদল শিকার করে, অপর দল কৃষিকাজ। যদিও প্রথমে এই কৃষিকাজ নারীরা করত, কিন্তু নারীরা একাজ চিরস্থায়ী ভাবে করতে পারল না। কারণ মাসে একটা সময় তারা ঋতুমতী থাকে এবং মাঝে মধ্যে তারা সন্তান-সম্ভবা হত। এই সময় আরেক দল মানুষ মাটির ছোটখাট জিনিষ মূলতঃ পাত্র বিশেষ তৈরী করত। এই সময়ও পাথর মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, তা হয়েছিল আগের তুলনায় উন্নত ও সুক্ষ। এই সমস্ত এবং আরো কিছু ঘটনার জন্য আগে তুলনায় সেই সময়কার সামাজিক নিয়ম হয়ে উঠল জটিল থেকে জটিলতর। সেই সময় মূলত ধর্মীয় বিধি-নিষেধও ছিল, ছিল সমাজের বা গোষ্ঠীর আইন-কানুন বা আচরণবিধি। তাই এরও পরিবর্তন ঘটলো স্বাভাবিক কারণে। প্রথমদিকে সমস্ত উৎপাদনই (কৃষি-মাটির পাত্র-পাথরের হাতিয়ার বা অন্য কিছু) গোষ্ঠীর সম্পত্তি বলে গণ্য হত। আর এই সমস্ত কিছু রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব থাকত একজনের হাতে। যাকে গোষ্ঠীপতি বলা হত। এই ব্যক্তিই ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে থাকতো। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে মানুষ ধাতুর আবিষ্কার করল। অর্থাৎ ধাতু নিষ্কাশন এবং ধাতুর ব্যবহার করতে শিখল, তখন শ্রম-বিভাজনও জটিল হল। সৃষ্টি হল সমষ্টিগত সম্পত্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পত্তির। বিত্তের ব্যবধান চিত্তের ব্যবধান গড়ে তুলল। বিশেষ ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মের ব্যবহার এই সময় থেকে শুরু হয়।

হ্যাঁ, এই গোষ্ঠীপতিরাই আজকের মোল্লা-পুরুত-যাজকদের পূর্বসূরী। স্বাভাবিক কারণেই তাদের স্থান সাধারণের উপরে। 'কবর'-এর পার্থক্য দেখে এই অনুমান করা গেছে। এই পার্থক্য শুধু গোষ্ঠীপতির নয়, সামাজিক বৈভব্যর পার্থক্যও সুনির্দিষ্ট করে। কিছুজনের কবরে পাওয়া গেছে দৈনন্দিন প্রয়োজনে থেকেও বেশী কিছু জিনিষ এমনকি অন্য কঙ্কালও। বাকীদের নিতান্তই সাদামাটা। এর চূড়ান্তরূপ আমরা দেখতে পাই মিশরের পিরামিডের মধ্য দিয়ে। যা ছিল রাজা-রাজরাদের। এই সময় শবদাহের পদ্ধতিও চালু হয়। মূলতঃ পচন রোধের জন্যই দাহ পদ্ধতি চালু হয়। যেহেতু তখন ''আত্মা'' বিষয়টি ধর্মের ক্ষেত্রে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল। সম্ভবতঃ সেইজন্যই দাহ করলে 'আত্মা' সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে এই ধারণাটি জুড়ে দেওয়া হল।

ধাতুর আবিষ্কার সাথে সাথে সৃষ্টি হল লাঙ্গলের, ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্র—যা আগের তুলনায় অনেকবেশী কার্যকরী, চাকার আবিষ্কার মানুষকে দিল দ্রুতগতি, মানুষ শিখল নদীতে বাঁধ দিতে যা উন্নত করল সেচ ব্যবস্থাকে, মানুষ বানালো ইট, শিখল আরো অনেক কিছু, যা মানুষের সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে দিল বেশ কয়েক ধাপ। পাশাপাশি মানুষের চিন্তাশক্তিকে করল সুদূর প্রসারী।

এত কিছু হওয়ার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। নিজের প্রয়োজনের অধিক সম্পত্তি জমা হতে থাকে। কারণ গোষ্ঠীর বা সমাজে সবাইকে এককাজে নিয়োজিত হতে হয় না। বিভিন্ন শ্রমে বিভিন্ন জন নিয়োজিত হয়। ব্যক্তিগত কুশলতার মাধ্যমে। এই সময় চালু হয় নিম্নস্তরের বিনিময় প্রথা। সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির। এইখানে সৃষ্টি হয় আদিম শ্রেণী-বৈষম্যের। ফলে সমাজব্যবস্থা আরো জটিল হয়ে পড়ে। নিয়ম-কানুন-লেনদেন ইত্যাদি। নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় নেতৃত্বদায়ী শক্তি প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট শোষণ কেন্দ্রের। এই সমস্ত কিছুই শুরু হয় নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগে আর সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে ঐতিহাসিক যুগে এসে। নব্য-প্রস্ত যুগের গ্রামগুলিরও গুণগত পরিবর্তন হয়। গ্রামগুলি বিরাট জনপদে পরিবর্ত্তিত হয় কারণ বশতঃ ধর্মীয় ব্যক্তি দ্বারা আর সমাজ পরিচালনা সম্ভব হয় না। সৃষ্টি হয় ব্যক্তি শাসক বা রাজার। তার সহয়তার জন্য থাকে পুরোহিত এবং আজ্ঞাবহ কিছু ব্যক্তি। স্বাভাবিক ভাবেই বিত্তবানেরা এই পদে অধিষ্ঠিত হন। তাছাড়াও এদের বিচার বুদ্ধি ছিল সাধারণের চেয়ে বেশী। আর পরিচালনের নিয়ম জটিল হয়। আর এর সাথে মিশ্র হয় সেই ধর্ম, যা ছিল তাদের অনুসন্ধিৎসার ভ্রান্ত ধারণা। এই সময় একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নুতন শাসকগোষ্ঠী তৈরী হওয়ার ফলে মুষ্টিমেয়ের অধীনে চলে যায় জনগণের ব্যাপকতর অংশ। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষভাগেই ধনী ও দরিদ্র বিভাজন স্পষ্ট হয়। দরিদ্র শ্রেণীকে 'দাস'-এর কাজ করতে হয়। এই সময় কিন্তু ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বৈরিতা ছিল না। কিন্তু উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির ফলে শাসক গোষ্ঠীর হাতেই অধিক সম্পদ সঞ্চিত হতে থাকে। আর এই উদ্বৃত সম্পত্তিকে আরো বেশী করার জন্য প্রয়োজন হতে থাকল শ্রমশক্তির। তাই ঐ দারিদ্রশ্রেণীকে ''আজ্ঞাবহ দাস''-এ পরিণত করা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল ধর্ম। এই সময় 'ধর্ম' আত্মপ্রকাশ করল শাসকশ্রেণী শোষণের বলিষ্ঠ হাতিয়ার

হিসাবে। হাজির করা হল পাপপূণ্যবোধ, ঈশ্বরের অভিশাপ-আর্শীবাদ, ইত্যাদি আর এর ধারা অনুসারে ধর্মীয় গুরুরা হাজির করেছিল পূর্বজন্ম-পরজন্ম কর্মফল ইত্যাদির ধারণা। এই বিভেদ অর্থাৎ সামাজিক বিভেদ ধরা পড়ে সেই সময়ের সমাজের চালচিত্র দেখলেই। গ্রীকদেশই হোক কিংবা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোই হোক। সেই সময় গড়ে উঠেছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই নগরে বসবাস করা অধিকার ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণীর অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী, পুরোহিত এবং তাদের অনুগামী বিত্তশালী অংশের। দাস বা দরিদ্র শ্রেণীকে থাকতে হত নগরের বাইরে। এই যুগের কোন এক সময়ে মানুষ লিপির ব্যবহার শুরু করে। যা ছিল যুগান্তকারী ঘটনা।

ঐ সময়ের শাসকশ্রেণী তাদের ক্ষমতা কায়েম বা দাস বা দরিদ্রশ্রেণীকে নিজেদের আনুগত রাখার জন্য নিত্য নতুন ধর্মীয় বিধান সৃষ্টি করেছিল। তারা প্রচার করল রাজা বা পুরোহিত 'ঈশ্বর' প্রেরিত দূত। আর এই ধারণাকে কেন্দ্র করে আজো পৃথিবীতে অবতার জন্মাচ্ছে। ঐতিহাসিক যুগের সময় রাজা বা পুরোহিতের বিশ্বাস বা আনুগত্য সৃষ্টির জন্য তৈরী হতে লাগল ধর্মীয়, অবিশ্বাস্য গল্পের। এই যুগের মধ্যভাগে চিন্তাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাটার সময় সামাজিক পরিস্থিতিই অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। দরিদ্রের দাসত্বের মানসিকতাই এর মূল কারণ।

ঐতিহাসিক যুগে এসে জন্ম নেয় ''পরিবার'' বা বিহার-বিধি। কারণ ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালে এই সম্পত্তির কে মালিক হবে সেটা ছিল এক সমস্যার। কোন্ সন্তানের মাতৃ পরিচয় স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কোন্ পুরুষের দ্বারা এই জন্মলাভ, তা নির্ণয় করা, সেই সময় দুরূহ ব্যাপার ছিল। কারণ ঐতিহাসিক যুগের শুরু সময় পর্যন্ত যৌনমিলন ছিল অবাধ। আর এই সমস্যা দূর করার জন্য সৃষ্টি হলো পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা-পরিবার ও বিবাহ। যেখানে পুরুষ প্রধান। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু নারীরা নয়। তাই নারীদের বিধান হলো সতীত্ব। তারই সৃষ্টি ''পতি পরম গুরু'' কিংবা ''বেহুলা—লক্ষীন্দরের'' আখ্যান। এই ধারা কিন্তু এখনো বর্তমান। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ছেলেদের গায়ে কলঙ্ক লাগেনা এই রকম আর কি। নারীরা এই বিধান মেনে নেয় তার কারণ একটাই। প্রথমে একাধিক পুরুষ দ্বারা নির্বাচিত হত বা যৌনমিলনে বাধ্য হতে হত, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এখন একজনের অধীনে। মনে রাখা উচিত নারীরাই সমাজের শোষিত অংশ। তারা সামাজিক নিয়মে হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এর উদাহরণ আমাদের মহাভারত। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির-বাবু দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে পণ রেখেছিলেন দ্রৌপদীকে।

এই সময় ধনী ও দরিদ্র বা দাস এই বিভাজন হয়। আসলে এই সময়ই দু'ধরণের ''ঈশ্বর'' সৃষ্টি হয়। একজন হয় গরীবের, যে ঈশ্বর তাদের মুক্তির প্রতীক এবং অন্য ''ঈশ্বর'' হলেন শাসকগোষ্ঠী, যার দ্বারা এই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণ ও অনুগামী করা যাবে। এই ধারা আজও বর্তমান। আর একে নির্ভর করেই আজকের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রভূত্বকে কায়েম রাখাবার জন্যই ধর্মকে বা তার আচারবিধিকে লিখিত বা লিপির আকার দিলেন। ফলে আরো কিছু বিধি-নিষেধ সংযোজিত হতে বাধ্য হল ঐ লিখিত ধর্মীয় বিধিতে। এল ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী এই ধনী-দরিদ্র এবং কর্মফলের জন্য মানুষের অবস্থান। যদিও দাসদের কাছে এই বিধান খুব একটা কার্যকরী ছিল না বা অভিপ্রেতও ছিল না। তাই দাসদের নানাসময় এর বিরুদ্ধে সরব হতেও দেখা যায়। সেই কারণে ধর্মীয় বিধানে দাসদের হত্যাকে অনুমোদন করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলে এর উল্লেখ আছে। সক্রেটিশের উদাহরণও প্রাসঙ্গিক কারণ সক্রেটিশ সেই সময়কার নগরবিধি এবং ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম ছিলেন সেই সময়কার পণ্ডিতেরা, যারা মূলতঃ রাজার তল্পিবাহক ছিলেন। যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল। ফলে সামাজিক ব্যবধান ও গড়ে উঠেছিল মানুষে মানুষে। তাই, একসময় মানুষের অনুসন্ধিৎসার ভ্রান্ত ধারণা থেকে গড়ে ওঠা ধর্মীয় আচরণ বিধি পরিণত হয় অনুশাসনে আর ঐতিহাসিক কালের শেষ পর্যায়ে এসে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠে, ঐ ধর্মীয় রীতিনীতির আদলের গুণগত পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে বাধ্য হয়। তার প্রকাশ পেতে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রের মাধ্যমে লিখিতভাবে। আর এতে বিশ্বাস বা আস্থা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময় প্রকাশ হয় অলৌকিক তত্ত্বে ভরা পুরাণ বা গাথার। একটা কথা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, যে গল্প কাহিনী বা গাথা প্রথমে শ্রুতিতে ছিল, পরে লিপির আকারে এল তার কিছু পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। আবার সামাজিক অবস্থার নিরিখেও বহু পরিবর্তন ঘটেছে। ঐতিহাসিকরা এর উদাহরণ বেদ বাইবেল কোরান-সর্বত্রই পেয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণেও এর নির্দশন আছে। যেমন রামায়ণ। মূল রামায়ণে রাম কর্তৃক দুর্গাপূজার উল্লেখ নেই। কিন্তু যখন কৃত্তিবাস বাংলার রামায়ণ অনুবাদ করেন তখন দুর্গাপূজার অর্ন্তভুক্তি ঘটে। তাছাড়াও 'রামায়ণ' বহু ভাষায় পাওয়া গেছে। দেখা গেছে তাদের মধ্যে বিস্তর ফারাক কিন্তু

মূল সুরটি এক। যাইহোক, এই ঐতিহাসিক যুগে যখন শ্রেণী বিভাজন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বা দৃঢ় হচ্ছে। অর্থাৎ শ্রেণীকর্তৃক শ্রেণী শাসিত হচ্ছে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার মূল কাজটি বহন করে এই ধর্মীয় অনুশাষণ। তাই ঐ লিখিত শাস্ত্রাদি হল ধর্মগ্রন্থ।

এছাড়াও ঐতিহাসিক যুগে শোষণ বা শাসনের স্বার্থে এই বিশ্বাসকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামাজিক পরিবর্তনও ঘটে। 'রাজাকে' সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়। পেশাগত ভাবে পুরোহিত পদের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক ভাবে রাজা ও পুরোহিত সম্প্রাদায়ের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ থাকলেও তারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আপোষ করে নেয়। কারণ একটাই মানুষ তার জীবন-নির্বাহের আচরণবিধি তৈরী করেছিল—এই ভ্রান্ত ধারণা সময়কালে ধর্মীয় রূপ পায়। এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিতে সাময়িক কারণেই হাজির হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। কারণ সেই সময় ঐ শাসকবর্গ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে শ্রেণী বিভক্ত মানুষের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। তাই তারা সুচতুরভাবে ধর্মকে 'মানুষ' বিভক্ত করার কাজে ব্যবহৃত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মনুসংহিতার কথা। কালের নিয়মে বা সামাজিক চাপে আজকের প্রচলিত ধর্মমত গুলিও বহুভাগে বিভক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির মধ্যে বৈষম্য কিংবা তার প্রভাব সম্বন্ধীয় আলোচনার সার গুরুত্ব এই আলোচনায় না থাকলেও একটা ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিত, তা হল মানবজীবনের বিবর্তন এবং মানবসভ্যতার বিকাশ সর্বত্র একসাথে ও একভাবে হয়নি। মূলতঃ ভৌগলিক পরিবেশ ও তার কারণে প্রতিকূলতাও ছিল বিভিন্ন। আর বিবর্তন এবং সভ্যতার বিকাশ গড়ে ওঠে বিভিন্নভাবে।

আসল কথা হলো যে 'ধর্ম' যখন ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবর্তিত হলো বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেল, সেই সময় সমস্ত কিছুই বিচার হতো ধর্মের মাপকাঠিতে। ফলে পাশাপাশি, যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা শাসক বর্গের স্বার্থের পরিপন্থী হতো, তাকে নস্যাৎ বা নির্মূল করা হতো নির্মমভাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই- গ্যালিলিওর চির-নির্বাসনে কিংবা মহাভারত মহাকাব্যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্বারা চার্বকদের পুড়িয়ে মারার কাহিনী। এইভাবে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার গতি রুদ্ধ করা যায়নি এবং যায় না। কারণ মানুষের অদম্য কৌতুহল অনুসন্ধিৎসা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষে মনে প্রশ্ন এসেছিল প্রকৃতি বা জগৎ ও প্রাণ সৃষ্টি রহস্য নিয়ে। সেইসময় থেকেই একদল মানুষ কল্পনার জাল বুনেছে নিছকই ভ্রান্ত ধারণা থেকে। আরেকদল মুষ্ঠিমেয় মানুষ এর পিছনে যুক্তি খুঁজেছেন। তাই সৃষ্টি হয়েছে দুধরণের মানুষ। ঐ একদল বিশ্বাসে বিশ্বাসী, আর অন্যদল যুক্তিতে বিশ্বাসী।

## বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০০৯

কবিতা

## যে তুমি ঈশ্বর শিরা-উপশিরায়

### অরণ্য (বাংলাদেশ-এর কবি)

যে তুমি ঈশ্বর গান গাইছো শিরা-উপশিরায়,
আর সুর থেকে একে একে ঝরে পড়ছে বিভার শিল্প;
সে তোমাকেই আমি একটু একটু ক্ষয়ে যেতে দেখছি
এই দ্বিধা ও সংশয়ের বেলায়।
শতছিন্ন ঐ মাদুরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে কারও ছায়া,
আর তুমি তখনও চোখ বুজে বসে আছো পরিপূর্ণ নদী।
এই ছিল আমাদের পললের দেশ, ফসলের মেলা,
আর যাবতীয় পীড়ার মাঝেও নীরব হেসে ওঠা।
হয়ত ছিঁড়ে যাবে আরও একটি তার,
খসে যাবে আরও শুভ তারা, তবুও
কি আমরা যে যার দূরত্ব থেকে আরও বেশি সরে আসব
না দূরত্বহীনতার রোদে, অভিন্ন ছায়ায়?
এই দ্যাখো কীভাবে অস্থির বিষন্ন এই সময়,
আর তুমি নির্বিকার গেয়ে চলেছো মধ্যরাতের রাগ।
জানি কবরের গাঢ় অন্ধকার থেকে কিছুই দেখা যায় না আর,
অথচ এক জোড়া বিশ্বাসী-চোখ তোমাকে বার বার
সরিয়ে আনছে তেঁতুল গাছের তলায়।

---

## আমি একটু একা থাকতে চাই—

### দেবযানী ভট্টাচার্য

আমি একটু একা থাকতে চাই
এই সভ্যতাকৃণ মানুষের জঙ্গলে একটু খোলা নিরালা চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই,
পালামৌ গিরিডির উদার পাহাড়ে
একটু একা একা হাঁটতে চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই।
মাঠভরা ধানক্ষেতের অঞ্চলে
একটু শরীর ডোবাতে চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই।
দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের জলে
একটু একা সাঁতার কাটতে চাই
আমি একটু একা থাকতে চাই।
দূরাগত সাঁওতালি ঢোলের তালে তালে
একটু, মনটা দোলাতে চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই।
জীবনানন্দের কবিতার আড়ালে
হৃদয়ের না পাওয়াগুলোকে একবার দেখতে চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই।
সাফল্যের সিঁড়ি টপকানো রোবটের দলে
একটু দল ছাড়া মানুষ হয়ে থাকতে চাই,
আমি একটু একা থাকতে চাই...
সমাজ, তুমি এই মেয়েটিকে অনুমতি দেবে কি?

---

## ঋতুরঙ্গ

### দেবযানী ভট্টাচার্য

আজ কেন বলো তোমায় এতো বেশী করে মনে পড়ছে?
হৈমন্তিক বিষণ্ণতায় কেন দু হাত বাড়িয়ে ডাকছে?
বাসন্তিক শিহরণ সে তো কবে ফেলে রেখে চলে এসেছি!
বৈশাখী দহণ দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি!
শমণরূপী শীতার্ত রাতের আসাও স্থির নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
তবে কেন শরীরে কানায় কানায় আষাঢ়-এর বাণ ডাকছে?
কেন আজি শেষ বিকেলে তোমাকেই, শুধু তোমাকেই মনে পড়ছে?

---

## নিচ্ছে শপথ

**বিকাশ ভট্টাচার্য্য**

ঘুরছে বাতাস
কাটছে হতাশ।
উড়ছে নিশান
বাজছে বিষাণ।
হাঁকছে কিষাণ
হও আপয়ান
বাজছে ডঙ্কা
কাটছে শঙ্কা।
চলছে মিছিল
চলবে মিছিল—
কাটবে বিপদ
নিচ্ছে শপথ।
ওদের দোসর
ভেঙেছে ঘর
গরীব জনতা নয় তো পর
কালো মাহুত সাদা হাতী
জোরসে ধর হাত
কাটবে রাত
ঘুরছে বাতাস
কাটছে হতাশ
মিথ্যা নয়
কাটছে ভয়।

## অনুত্তমা

**সিদ্ধার্থ দত্ত**

কেউবা বলে : বুদ্ধি তুখোড়, ইমেজ রাখে ভালো
কেউবা বলে : মনটা দরাজ, পরের জন্যে দিল;
কেউবা বলে : দায়িত্বটা — ইচ্ছে করেই নেয়
কেউবা বলে : তা নিগ্‌গে — কাজটা হলেই হয়।

কেউবা বলে : ব্যস্তবাগীশ — ঘরসংসার নেই
কেউবা বলে : অফিস-বাড়ি — কাজের মধ্যে এই;
কেউবা বলে : চৌকস মেয়ে — বাইরে-ঘরে দুই
কেউবা বলে : বেকার খাটে — দরকারটা কই?

দিদির প্রশ্ন : বাড়ি বসেও অফিস করে কেন?
একটু ক্ষণের জন্যে সোনার ফুরসত নেই যেন
এত চাপের ফলে বোনের শরীর খারাপ হয়
একরোখা মেয়ে, আমার কথায়, পাত্তা কোথায় দেয়।

এমনি করেই মন্দ-ভালোর চাপান-উতোর চলে
যেমন করে বিশ্রী-শ্রী-এ চু কিত্‌ কিত্‌ খেলে;
দু-এর মাঝে ধন্যি মেয়ে, উদাসভাবে বলে :
শান্তিকণায় স্নিগ্ধ হলে সুনীল আকাশ মেলে।

নিন্দেমন্দ আমিও করি নিরপেক্ষ নই
পি এন পি সি-র বৃন্দগানে নিজেও সামিল হই;
বাধ সাধল দোলনচাঁপা, হাস্নুহানা, জুঁই
বলল, ছড়ার নাম রাখ্‌না — অনুত্তমা — তুই।

## ছোট ছোট স্বপ্নগুলো

**শুভংকর**

আরও কিছুদিন, আরও কিছু মুহূর্ত
এভাবেই পেরিয়ে তোর হাত ধরে
একরাশ ইচ্ছের আড়ালে

আমাদের ছোট ছোট স্বপ্নগুলো
ডানা মেলে,
ছুঁয়ে দেখে উড়ানের রঙ,
হারানোর সঙ্গী পায়....

আমাদের ছোট-ছোট স্বপ্নগুলো
বয়ে চলে....
খুঁজে নেয় স্মৃতির ঝিনুক,
আরও তুচ্ছ হতে চায়।

আমি আর তুই শুধু থাকি,
এতদিনও যেমন ছিলাম...
অপেক্ষায়।

## হিং টিং ছট্

**কনক কুমার ঘোষ**

চট্ পট্
চট্ পট্ .....।
ইঁদুর দৌড় শুরু
চট্ পট্
চট্ পট্ .....।
সবাই সবার আগে
কারও পিছে কেউ নয়—
চট্ পট্
চট্ পট্ .....।
অর্থম্
স্বার্থম,
নতুবা অনর্থম্;
ভোগবাদ, মাওবাদ,
আজকের সংবাদ;
এটা নাই, ওটা চাই,
আরও আরও টাকা চাই—
চট্ পট্
চট্ পট্ .....।
মানবিক, দানবিক,
সন্ত্রাস, বিশ্বাস—
মুখোশের ছড়াছড়ি
ঠিক্‌ঠাক্ বাছা চাই—
টাকা চাই।
টাকা চাই.....।
ঢেঁকি ওঠে
ঢেঁকি পড়ে,
ন্যায় আর অন্যায়;
ইতিহাস থেমে গেছে—
আগে চায়, পিছে চায়!
বিছানাতে ছট্ ফট্
ঘুম নাই, ঘুম নাই—
হিং টিং ছট্-টার
মানেটা যে বোঝা চাই!
চট্ পট্
চট্ পট্ .....।

## চাইতে পারি

**পারমিতা**

একটা সময় চাই—
খানিকটা অধিকার,
অভিমানের অধিকার চাই,
আনন্দের অধিকার চাই,
আবার দুঃখেরও অধিকার চাই।

একটা মুহূর্ত চাই
ভালোবাসার মুহূর্ত,
নিরিবিলির মুহূর্ত,
সমবেদনার মুহূর্ত
আবার মিশে যাওয়ারও মুহূর্ত।

এবার একটা শর্ত চাই—
কাজ করার শর্ত,
এগিয়ে চলার শর্ত,
বুঝে নেবার শর্ত,
আবার চাইবার শর্ত।

সমস্ত কিছু কার কাছে?
উদার্ত্ত পৃথিবীর আকাশে বাতাসে
না তোমার আমার মাঝে—
এবার ভাবো তোমার মত করে।

ভালো একটা পৃথিবী চাই—
মুগ্ধের পৃথিবীর সুস্থতা চাই,
আলোকময় জীবন চাই,
আবার বেঁচে থাকার আশা চাই।

## গুচ্ছকবিতা

**পল্লবরণ পাল**

**ওঁ জবাকুসুম সন্ত্রাস**
আছে জানি
টের পাই
নিভৃত শিরার পরমাদে

শব্দে বাজে
শুনি
কানে

প্রতি দু'টি অক্ষরের
ফাঁকে জমা মেঘ নিনাদে

বুকের গোপানে পোষা
বেড়ালের শরীরের থেকে
উঠে আসে
তালব্য 'শ'-এর সন্ত্রাস

তারপর চোখ মেলে
অঙ্গুলিরা জপের মালার
টুটি টিপে ধরে লেখে

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশ.....

**সন্ত্রাসের জন্ম**

যে শিশু জন্ম নিলো আজ মধ্যরাতে
তার নাম রেখেছি সন্ত্রাস
বঙ্গভূমি-সগৌরবে ছিলো ব্যতিক্রম
একটু আগে হয়েছেন লাশ

যে নারী বেইজ্জতি ঘোমটায় ঢেকে
অন্ধকার গলিপথ চিনে
পুরস্কার তুলে দেবে বলে ভেবেছিলো
তাই এ সময়-ডাস্টবিনে
রেখে গেছে নিন্দনীয় অনিন্দ্যসুন্দর
শিশুকে-কিন্তু কার পাপ
সময় না ধর্ষক-ইচ্ছে ছিলো তার
বলে যাবে-কে শিশুর বাপ
শুনলো বসে তিনজন জ্ঞানী পিতামহ
যাঁরা খুঁজছে নগর-বাথান
শিশুটিকে হাতে নিয়ে তিনটি রাইফেল
কেড়ে নিলো জননীর জান
তিন জ্ঞানী হাত ধুয়ে মদ্যটদ্য গিলে
কাহিনী কী বলা হবে ঠিক
সাজিয়ে গুছিয়ে ফিরে প্রেসক্লাবে বসে
বিবরণে হাজার গিমিক
বঙ্গভূমি কী কী ভাবে করেছে লাঞ্ছনা
মৃত্যুকালে বলে গেছে নারী
মিডিয়ার টিআরপি-র কমিশন নিয়ে
সারাদিন গেল ব্যস্ত ভারি
বাড়ি ফিরে শিশু হাতে বলে চিত্রকর
শরীরের রঙটা আমার
কবি বলে চোখদু'টো? আমার স্বপ্নের
নাট্যকার নিজের জামার
কলার ঝাঁকিয়ে বলে চিনতে পারেনি
মাগিটাও মেক-আপটা বলো?

রাজধানী জুড়ে দাঙ্গা ঘরের বাইরে
ভেতরে গেলাস টলোমলো।

যে শিশু জন্ম নিলো আজ মধ্যরাতে
তার নাম রেখেছি সন্ত্রাস
পিতামহদেব থেকে বাঁচাতে কন্যাকে
বঙ্গভূমি হয়েছেন লাশ

**জ্ঞানেশ্বরী ২৮.০৫.২০১০**

নভোচারী হয়ে উড়ছে রেলের কামরা
ভেতরে মুন্ড হাত পা এবং আমরা
বাইরে তোমরা তুমুল তর্কাতর্কি
পার্টি মিডিয়া বুদ্ধিজীবির চরকি
যে যার মতোন ব্যস্ত ইমেজ-গণিতে
পরিবর্তন রঙিন অঝোর শোণিতে
নাশকতা কার? কার দিকে সন্দেহ?
আকাশে ঝুলছে শ্রেণীহীন শবদেহ।

**তুমি গেলে-মধ্যরাতও**

আমার জীবনে আর মধ্যরাত বলে কিছু নেই
আমার জীবনে আর তেপান্তর বলে কিছু নেই
আস্তাবল থেকে সেই সাদা ঘোড়াটাও চলে গেছে
তেরোটা নদীর নাম ভূগোল বইয়ের থেকে হাওয়া
রাতের ডিনার শেষ কাঁটায় কাঁটায় দশটায়
সাড়ে দশটার পরে ইদানিং ভোর ছ'টা দশ
মাঝখানটুকু সাদা পৃষ্ঠা কিম্বা পাতাগুলো নেই
আদৌ বই কি ছিলো? নাকি সন্ত্রাস সেখানেও?
রক্তে চিনি-লবন লঙ্কা গুঁড়োমশলা-গণিত
গণতান্ত্রিক মেদ মধ্যপ্রদেশ সমীপেষু
হেঁটে হেঁটে তেরো পাক পৃথিবী প্রদক্ষিণ রোজ
সূর্য ডোবার পরে সিগারেট দোকানে কারফিউ

তবু কিছু মানে হতো-শিয়রে থাকতে যদি তুমি
তবে কি পাঁচিলে এসে বসেছিলো অবসাদ-পাখি?
ভেবেছিলে ক্লান্তি-ঘাম সময়-ওষুধে মুছে যাবে?
তাই বুঝি চলে গেলে-মধ্যরাত নিয়ে তেপান্তরে
শৃঙ্খলার ঘেরে আমি দ্বীপান্তরে যাবজ্জীবন

প্রেস্‌ক্রিপশনে লেখা বড়ো বড়ো করে-সন্ত্রাস!

# স্বপ্নের ফেরিওলা

**অমূল্যভূষণ পাল**

আমার বুকপকেটের কোটরে একটা চিরকুট
তাতে যৎসামান্য স্বপ্নের আঁকিবুকি,
পিঠোপিঠি গুপ্তি পকেটে
আমার গোনাগুনতি সম্বল
আর তার পেছনেই ধুক্‌পুক্
আমার পরিশ্রান্ত প্রাণস্পন্দন।

মোদ্দা কথাটা দাঁড়ালো
আমার স্বপ্ন সংগতি ল্যাপটপ্
এরা পরস্পর গায়ে গা লাগানো পাড়াপড়শি
সাকুল্যে ত্রিস্তর এই একটিমাত্র লকারে
অল্পবিস্তর আমার যা কিছু পার্থিব,
আমার দুর্ভিক্ষের সম্বল।

আমার স্বপ্নের গুলি-পাকানো গুটিপোকার
নাইবা গজালো ডানা
সে-ই আমার পারের কানাকড়ি
আমার নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংগতি
সে-ই আমার সাত রাজার ধন মাণিক
আমার দুঃখি কলিজার ধুকপুকানি
তাতে নাই বা থাকলো ব্যাঘ্রবিক্রম

তবু এই নিয়েই আমার ছাপোষা বেঁচে বর্তে থাকা
আর থেকে থেকে তেরে উঠে আনতাবড়ি
লাঠি ঘোরানো চিৎকার—

কালো ফেট্টি বাঁধা মুখে কারা তোমরা
লাল আকাশে রাতের চামচিকে ওড়াচ্ছো?
কতো আর দুঃসাধ্য করবে বীরের জীবনকে
মহৎ জীবনে যার অধিকার?
অম্লান ভবিষ্যতের ঝাঁক ঝাঁক পয়মন্ত পায়রারা
পতপত ডানার পতাকা মেলছে ওর হাতে
স্বার্থের আর ষড়যন্ত্রের ছানি-কানা চোখে যারা দেখছে না

তারা তফাৎ যাক্
তারা নিপাত যাক্

হুস্
হুস্

---

# Friendship

**Ananya Chakraborty**

When you feel sad and betrayed,
Who can you recall for every single moment?
When you feel lost and deprived,
Who will be there in every way?

When you make mistakes and regret
Who can you look upto to admit you are wrong?
When you feel life is a standstill
Who will be there to make your journey long?

When you are looking for answers,
To all your questions and dreams
There is one person on whom you can rely
It's impossible, I know, it seems.

But take a few moments to look deeper inside
Look into your heart and there you will see
You'll be surprised to find out
That you have been looking at me.

---

# Silence

**Ananya Chakraborty**

Somewhere deep down inside 'silence' speaks....
Weeps, smiles, groans......and much more
Deeper than words, much stronger than feeling,
Much intense than emotions......ah! What not
Where the sojourn of word ends, silence begins its journey.
In its own manner, own flow, own pace.
Silence reigns where distance prevails,
Gives vent to pent-up emotions......
It's a gateway to introspection, restrospection.
Silence accompanies when we are in solitude;
A wonderful experience to cherish, a memory
To carry on with the rest of our life.

---